সুমন্ত আসলাম

তবুও তোমায় নামে

যুথী বলল, 'জানিস, আমি না একজনকে ভালোবাসি।'

সৌম্য বলল, 'আমিও।'

ওদের কথা শুনে বিন্তী হেসে হেসে বলল, 'ভালোবাসি আমিও।' জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে থাকা সুশান্ত ঘুরে দাঁড়াল। মুচকি হাসলো সেও, 'ভালো কিন্তু আমিও বাসি।'

সবার কথা শুনে পাভেল কিছুটা চিৎকার করে বলল, 'ভালোবাসায় আমি ডুবে যাচ্ছি, ডুবতে ডুবতে অতলে পৌঁছে গেছি। আমিও ভালোবাসি, খুব বাসি খুব।'

ভালোবাসা এমনই, কিন্তু সমস্যা হলো– যুথী, সৌম্য, বিন্তী, সুশান্ত, পাভেল, এই পাঁচজন ভালোবাসে একজনকে। একজনই তাদের ভালোবাসার উৎস, ভালোবাসার আশ্রয়, ভালোবাসার স্পন্দন।

এটা কি করে সম্ভব! পাঁচজন কী করে একজনকে ভালোবাসে!

সম্ভব। যদি সে ভালোবাসায় প্রগাঢ়তা থাকে, আত্মার ছোঁয়া থাকে, মনের আকুতি থাকে, থাকে হৃদয়ের গভীরতা।

কিন্তু কথা হলো– ওরা কাকে ভালোবাসে? কার জন্য এই উন্মাদনা? এই হৃদয় গলানো পাগলামি?

প্রিয় পাঠক, পরিপূর্ণ ভালোবাসার উপন্যাস এটা, অন্যরকম এক ভালোবাসার। যে ভালোবাসা সবাই বাসে, হৃদয়বানরা বাসে, শুদ্ধ মানুষেরা বাসে।

আপনি বাসেন তো?

তবুও তোমায় আমি

সুমন্ত আসলাম

© লেখক

তৃতীয় মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১০
প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১০

সময়

সময় ৭৬৩

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
গুপু ত্রিবেদী

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
হৃদয় অনীক প্রিন্টার্স
পল্টন টাওয়ার, পুরানা পল্টন, ঢাকা

মূল্য : ১২৫.০০ টাকা মাত্র

TOBUO TOMAY AMI a novel by Sumanto Aslam. First Published in Book Fair 2010 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka 1100.
Web: www.somoy.com E-mail: f.ahmed@somoy.com
Writer's E-mail : sumanto_aslam@yahoo.com

Price : Tk. 125.00 Only

ISBN 984-70114-0163-0 Code 763

নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র 'সময় . ', প্লাজা এ. আর, (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন)
ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন ৯১১৬৮৮৫

খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আমার। ছোট্ট একটা লাইব্রেরি করেছি। সাগুফতা হাউজিংয়ের একটা জায়গায়, ছুটির দিন সকালে চলে যাই আমি সেখানে, কাটিয়ে দেই সারাটা দিন—বই পড়ি, লিখি, নাম-না-জানা হরেকরকম পাখি দেখি, কিছু একটা খাওয়াতে খাওয়াতে গল্প করি প্রতিবেশী কাকদের সঙ্গে, কোনো কোনো দিন একপাওয়ালা কোনো শালিকের সঙ্গে। শুক্রবার ছিল সেদিন, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯। লাইব্রেরিতে বসে আছি, ধূসর একটা পাখি দেখছি। হঠাৎ একটা ফোন, সমস্ত পাঁজর ভেঙে দেওয়া ফোন। নদীতে গোসল করতে গিয়ে আমার বড়বোনের একমাত্র ছেলে আর মেজবোনের বড় ছেলে—দুজন, একসঙ্গে পানিতে ডুবে মারা গেছে। একই বয়সী ছিল ওরা, চব্বিশ বছরের যুবক ছিল দুজন।

প্রিয় মাহমুদ

প্রিয় নাজমুল

বাবা রে, তোরা তো জানিস—আমি যতটা রাগী মানুষ, আবেগীও ঠিক ততটা। অল্পতেই রেগে যাই, নিশ্চুপ হয়ে যাই আবার অল্পতেই। তোরা আমাকে ক্ষমা করে দিস, বাবা। একা থাকলেই, চুপচাপ কিছু একটা ভাবতে নিলেই, তোরা দুজন এসে আমার পেছনে দাঁড়াস, স্পষ্ট টের পাই আমি সেটা, ঘ্রাণ পাই তোদের পবিত্রতার। স্রষ্টার কাছে আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করি—পরজনমে স্রষ্টা যেন আমাকে তোদের মতো বানায়, তোদের মতো শুদ্ধ যুবক হওয়ার আকুতি জানাই আমি তাঁর কাছে!

বারাক হোসেন ওবামা
প্রেসিডেন্ট
হোয়াইট হাউস, ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকা

সম্মানীয় প্রেসিডেন্ট

খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে নির্বাচনের আগে আপনি বলে বেড়াতেন—Change We need. বাংলায় তার আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায়—পরিবর্তন আমাদের প্রয়োজন কিংবা আমাদের পরিবর্তন প্রয়োজন। আপনার বলার মধ্যে দৃঢ়তা ছিল, গতি ছিল, ছিল এক ধরনের উন্মাদনাও। কিন্তু আমাদের বলতে আপনি কী বুঝিয়েছেন, আমেরিকানদের পরিবর্তন প্রয়োজন? আমেরিকার প্রতিটি ব্যক্তির পরিবর্তন প্রয়োজন? ব্যক্তি কিংবা সামষ্টিক বাদ দিয়ে আমরা বুঝে যাই পরিবর্তন আসলে আপনার প্রয়োজন!

নির্বাচনে জয় লাভ করলেন আপনি, দামী দামী ভাষণও দিলেন, নতুন প্রত্যয় নিয়ে ক্ষমতার চেয়ারও স্পর্শ করলেন। তারপর কতটুকু পরিবর্তিত হয়েছেন আপনি? ইরাকে যে অমানুষিক নৃশংসতা চলছিল সেটা তো এখনো চলছে! এখনো সেখানে প্রতিদিন রক্তে ভেসে যায় রাজপথ, বাড়ির উঠোন, ঘরের মেঝে। শিশুদের এখনো ঘুম ভাঙে স্প্লিন্টারের শব্দে, তারা আকাশে চাঁদ কিংবা সূর্যের আলো দেখার পরিবর্তে বিস্ফোরণের আলো দেখে, তারা বাতাসে নতুন বসন্ত আর ফুলের গন্ধের পরিবর্তে বারুদের গন্ধ পায়। আর শ্রদ্ধেয় নারীগণ, যাদের অধিকাংশই প্রতিদিন শ্লীলতা হারাচ্ছে, ভোগ্যপণ্য করে তুলছে আপনার সৈন্যরা। তারা কাঁদে, আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে কাঁদে। আপনি শুনতে পান তাদের কান্না? সেই কান্না শোনার মানবিক হৃদয় আপনার আছে? আছে সেই মানবতা বোধ? মানবতা সেখানে ডুকরে ডুকরে কাঁদে, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত।

আগে যেমন ছিল এখন তেমনই আছে আফগানিস্তান, এখনো সেখানে মানুষ মারা যায় পিঁপড়ের মতো, এখনো সেখানে লাঞ্ছনা নিয়ে চলাফেরা করে প্রতিটি মানুষ।

আপনাদের বিদেশনীতির কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? কিউবা, ভেনেজুয়েলা, চীন কিংবা অন্য কোনো সম্পদশালী অথচ সম্পদ ব্যবহার করতে না জানা কোনো দেশের প্রতি? কিংবা তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের প্রতি? গ্যাস, তেল, সোনার প্রতি আমেরিকার আগের প্রেসিডেন্টগুলোর যেমন লোভ-লালসা ছিল আপনার কি তেমন নেই? আপনি কি তার চেয়ে অন্যরকম? অস্ত্র বিক্রি কি আমেরিকার কমেছে? কার কাছে বিক্রি করে এসব অস্ত্র, কীসের জন্য করে, কার বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে এসব? পারমানবিক বোমা এখন কার সবচেয়ে বেশি। জানি, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করবে আপনার!

শুনুন মি. প্রেসিডেন্ট, বাংলায় একটা কথা আছে—দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা। কাল সাপ চেনেন? কাল সাপ হচ্ছে সেই সাপ, যা একবার ছোবল দিলে কেউ বাঁচে না। আপনি লিখে রাখুন, আপনার ডায়েরিতে অথবা আপনার বুকের গোপন প্রকোষ্ঠে—যে ইসরাইলকে অবৈধ স্থান করে দিয়েছেন আপনারা, যাকে আপনারা দুধ কলা তথা পারমানবিক বোমা, আধুনিক অস্ত্র আর সমস্ত সুবিধা দিয়ে পুষছেন, যার মাথায় হাত রেখে মধ্যপ্রাচ্যে নরকের আগুন জ্বালানো হয়েছে, এই ইসরাইলই একদিন আমেরিকার বুকে তার প্রথম পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করবে। ছারখার করে ফেলবে পুরো আমেরিকা। সেদিন কেউই পালানোর সুযোগ পাবে না। বিশ্বাস করুন অথবা না করুন, লিখে রাখুন কথাটা—ডায়েরিতে অথবা বুকের মাঝে।

চিঠিটা লেখা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল ওরা—সৌম্য, পাভেল, যুথী, সুশান্ত আর বিন্তী। দু হাত দু দিকে টান টান করে আড়মোড়া ভেঙে পাভেল বলল, 'এখন আমরা কী করব?'

যুথী বলল, 'এই পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়তে পারি কিংবা যার যার বাসায় গিয়ে দুধ আর কলা দিয়ে ভাত খেয়ে তৃপ্তির একটা ঢেঁকুর তুলতে পারি। তারপর নাক ডেকে ঘুমাতে পারি যার যার নরম বিছানায়।'

'না, আমরা এ দুটোর একটাও করব না।' সৌম্য চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, 'আমরা আমাদের মতো চলব, আমাদের কাজ করব, যেমনটা শুরু করেছিলাম আমাদের যার যার পরিবারে, এখন শুরু করব সারাদেশে। প্রমিজ।' সৌম্যর বাড়িয়ে দেওয়া হাতের ওপর প্রথমে হাত রাখল বিন্তী, তারপর পাভেল, সুশান্ত; একটু ভেবে, সবশেষে যুথী।'

ঝট করেই কখনো কোনো কাজ করে না যুথী। ছোট কোনো কাজ করার

আগেও ও একটু ভাববে, একটু চিন্তা করবে। আর ওর সম্বন্ধে সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট কমেন্টস হচ্ছে—ও সবসময়ের জন্য জেদী, কিছুটা রাগীও।

যুথীর বাবা মারা যাওয়ার দিন সবাই কাঁদছিল, আর ও বসেছিল চুপচাপ। কী যেন ভাবছিল। সুশান্ত যুথীর কাঁধে একটা হাত রেখে বলেছিল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে তোর, না?'

'না।' যুথী রুঢ় স্বরে বলেছিল।

'তাহলে ওভাবে বসে আছিস কেন?'

'একটা জিনিস ভাবছি।'

'এখন এত কিছু ভাবার দরকার কি?'

'এখনই ভাবার দরকার।' উঠে দাঁড়ায় যুথী। সুশান্তর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল।'

'কোথায়?'

'ব্যাংকে।'

'ব্যাংকে!' সুশান্ত অবাক হয়ে বলল, 'এখন ব্যাংকে কেন?'

'তোকে যেতে বলছি চল।'

'পাভেল, সৌম্য, বিন্তীকে বলবি না।'

'বাবা মারা গেছে আমার, আর কাঁদছে ওরা! কাঁদতে দে ওদের। আমরা যাব আর আসব।' ঘরে গিয়ে একটা বড়-সড় ব্যাগ নিয়ে আসে যুথী। সুশান্ত এখনো অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। যুথী কিছুটা শব্দ করে বলে, 'ওভাবে ইডিয়টের মতো তাকিয়ে থাকবি না তো! আমি তো কারো ঘরে আগুন দিতে যাচ্ছি না, কাউকে খুন করতেও যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি ব্যাংকে। এতে অবাক হওয়ার কী আছে!' সুশান্তর একটা হাত টেনে ধরে বলল, 'চল।'

যুথীর বাবা আজিজ সাহেবের একটা অভ্যাস ছিল—ওর জন্মদিনে কিংবা কোনো অকেশনে একটা করে চেক দিতেন তিনি ওকে। চেকে সই থাকত, তবে কোনো টাকার অঙ্ক লেখা থাকত না, ওর যা প্রয়োজন চেকে তা লিখে যেন তুলে নিতে পারে সে সেটা। কাজটি কখনো করেনি যুথী। ওর যা প্রয়োজন পড়ত চেয়ে নিত ওর বাবার কাছ থেকে।

চেকগুলো বাবাকে ফেরত দিতে চেয়েছে সে অনেকবার, আজিজ সাহেব তা নেননি একটিবারও। অগত্যা সে সেগুলো রেখে দিয়েছিল তার ওয়ারড্রোবের একটা ড্রয়ারে। ওখান থেকে একটা চেক নিয়ে সুশান্তকে সঙ্গে

করে ব্যাংকে ঢুকেই যুথী বলল, 'প্লিজ, এখানে কোনো কথা বলবি না। আমি যা করব তা শুধু দেখবি, কোনো প্রশ্ন না, কোনো জিজ্ঞাসাও না।'

পুরো বিশ লাখ টাকা তুলে হাতের বড় ব্যাগটাতে ভরে সুশান্তর হাতে দিল যুথী। সুশান্তর বাবার সোনার দোকান, ঠিক সোনার দোকান না, সোনার জিনিসপত্র তৈরি করার দোকান। লক্ষ্মী জুয়েলার্সের মালিক তিনি। ছোট খাটো একটা স্বর্ণকারের ছেলে কোনো দিন এত টাকা হাতে নেওয়া তো দূরের কথা, চোখেও দেখেনি। ব্যাগটা হাতে নিয়ে সুশান্ত একটু কাতর স্বরে বলল, 'কত টাকা আছে রে এখানে!'

'এ কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?'

'যা ভারী না।'

'ঠিক আছে তোকে নিতে হবে না। আমি তো হাতে করে নিতে পারব না, আমার মাথায় তুলে দে।' জেদী গলায় বলল যুথী।

সুশান্ত কিছু বলল না। ও জানে, আর কিছু বললে চিৎকার করে উঠবে যুথী, স্থান-কাল দেখবে না, একনাগাড়ে চিৎকার করে যাবে ও।

ব্যাংকের সামনে রাখা গাড়ির কাছে এসে যুথী বলল, 'পেছনে তাকা তো, ভালো করে একটু খেয়াল কর।'

'কেন?'

'দেখ তো কেউ ফলো করছে কি না?'

'ফলো করবে কেন?'

'ফলো করবে কেন সেটা পরের কথা, তার আগে দেখ ফলো করছে কি না।' যুথী কিছুটা চিবিয়ে বলার মতো করে বলল।

পেছন ফিরে তাকাল সুশান্ত। কিছুক্ষণ ভালো করে দেখে বলল, 'ব্যাংকের সামনে তো অনেক মানুষ, সব অপরিচিত মানুষ। কেউ ফলো করছে কিনা তা বুঝব কী করে?'

'দেখ, আমাদের দিকে কেউ তাকিয়ে আছে নাকি?'

'আমার দিকে নাই, তোর দিকে তাকিয়ে আছে।'

'আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে কেন?'

'তুই একজন রূপবতী কন্যা, সেজন্যে।' সুশান্ত গাড়িতে উঠতে উঠতে বলে, 'টাকার ব্যাগ আমার কাছে, আর মানুষজন দেখছে তোকে, চোখ মেলে তাকাচ্ছে তোর দিকে। তার মানে আমাদের কেউ ফলো করছে না। সুতরাং নো টেনশন, তাড়াতাড়ি বাসায় চল। আমাদের এতক্ষণ না পেয়ে ওরা

বোধহয় অস্থির হয়ে গেছে।'

'অস্থির হওয়ার কিছু নেই। দরকার হলে মোবাইল করবে।' ড্রাইভার নিয়ে আসেনি যুথী, গাড়ি স্টার্ট দিল ও।

খুব শান্ত ভঙ্গিতে গাড়ি চালাচ্ছে যুথী। ওকে দেখে বোঝার উপায় নেই, আজ ভোর রাতে হার্ট অ্যাটাক করে ওর বাবা মারা গেছেন! অথচ ওর বাবা খুব ভালোবাসতেন ওকে। একজন বাবা হিসেবে যতটুকু করার দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি করেছেন ওর জন্য। ওর জন্য আলাদা একটা বাড়ি করে দিয়েছেন তিনি, যাতে যার সঙ্গেই বিয়ে হোক বিয়ের পর যেন কোনো অসুবিধা না হয়; ভার্সিটির গাড়িতে ভিড়ের জন্য দম আটকে আসে ওর, ওর বাবা এরজন্য ওকে একটা গাড়িও কিনে দিয়েছেন, ড্রাইভারও রেখে দিয়েছেন একটা। যদিও যুথী নিজেও গাড়ি চালানো জানে। আর ব্যাংকে যে কত টাকা রাখা আছে ওর নামে, সেটা ওর বাবাও জানেন না, যুথীর জানার তো প্রশ্নই আসে না।

বাসায় পোঁছেই যুথী দেখে বাসা ভরে গেছে মানুষে। ওর বাবা কাস্টমের বড় কর্মকর্তা ছিলেন। সব কলিগ ছুটে এসেছেন বাসায়। শোক জানাতে সবাই এসেছেন স্যুট-টাই পরে, পলিশ করা জুতো পরে; আর বাবার মহিলা কলিগ তিনজন তো রীতিমতো সাজিয়ে এনেছেন নিজেকে। ঠোঁটে রঙ আর গালের চামড়ার ভাঁজ ঢাকতে পুরো আধা ইঞ্চি লালচে রঙের প্রলেপ দিয়ে এসেছেন। কেউ কেউ আবার কালো রঙের চশমাও পরে এসেছেন, যাতে তাদের বর্ণচোরা চোখ কেউ দেখতে না পায়, তাদের আসল রূপ কেউ বুঝতে না পারে।

বিকেলের দিকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আজিজ সাহেবকে। ওরা সবাই গিয়েছিল করবস্থানে। মেয়েদের ওখানে যাওয়া নিষেধ, বিন্তী আর যুথী তবুও গিয়েছিল। যুথীর বাবাকে যখন কবরে নামিয়ে বাঁশের ঢাকনা দিতে যাবে, ঠিক তখনই ও চিৎকার বলল, 'স্টপ। বাবার কবরে কিছু জিনিস দিতে হবে আমাদের।'

দোয়া পড়া বাদ দিয়ে হুজুর চমকিত চোখে যুথীর দিকে তাকান। যুথী একটু এগিয়ে গিয়ে বলুল, 'জি, কিছু টাকা দেওয়া দরকার বাবার কবরে। কারণ সারাজীবন তিনি এতো টাকা রোজগার করেছেন, এতো টাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না আমাদের, এখনো নেই। তাই কিছু টাকা বাবার সঙ্গে তার কবরে দিতে চাচ্ছি, যদি কোনো কাজে লাগে।'

হুজুর দোয়া পড়া বাদ দিয়ে ভরাট স্বরে বললেন, 'নাউজুবিল্লাহ। কবরে টাকা দেওয়া যাবে না।'

'কবরে টাকা দেওয়া যাবে না এটা কোথাও লেখা আছে? কবরে কাপড় দেওয়া যাবে, কর্পূর দেওয়া যাবে, গোলাপ জল দেওয়া যাবে, বাঁশের ঢাকনা দেওয়া যাবে, সেখানে টাকা দিলে অসুবিধা কোথায়?'

'কবরে টাকা দেওয়ার কোনো নিয়ম নাই।'

যুথী হুজুরের ঠিক সামনে গিয়ে বলল, 'টাকা যদি কবরে নিয়ে যাওয়ার কোনো নিয়মই না থাকে মানুষ তাহলে কেন এতো টাকা ইনকাম করে, কেন তারা টাকার জন্য পাগল হয়ে যায়, অবৈধ উপায়ে সম্পদের পাহাড় গড়তে তারা কেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলে? আপনি বলতে পারবেন? আমার বাবা এই শহরে দু দুটো আলিশান বাড়ি করেছেন। একজন কাস্টম অফিসার হিসেবে কত টাকা বেতন পেতেন তিনি? বেতনের সঙ্গে আর কত টাকা ঘুষ পেলে এরকম দুটো বাড়ি করা যায়?' যুথী একটু থেমে বলে, 'দেশে আজ স্পষ্ট দুটো শ্রেণী এক সঙ্গে বাস করছে—এক শ্রেণী প্রতিদিন ধনী থেকে ধনী হচ্ছে, আরেক শ্রেণী হচ্ছে গরিব থেকে গরিব। এটা পাল্টাতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব বদলাতে হবে এটা।' কথাটা শেষ করেই টাকা ভর্তি ব্যাগটা হঠাৎ ঢেলে দেয় আজিজ সাহেবের কবরের ভেতর। কেউ তাকে বাঁধা দেওয়ার আগেই সবটুকু ব্যাগ খালি করে ফেলে সে। তারপর আর এক সেকেন্ড দেরি না, খুব দ্রুত পায়ে চলে আসে সে সেখান থেকে; সঙ্গে সুশান্ত, বিন্তী, সৌম্য, পাভেলও। সারা রাত সেদিন ওরা হেঁটেছিল। হাঁটতে হাঁটতে যুথী বলেছিল, 'বলতো, ওই যে মেয়েগুলো হাঁটছে—।' আঙ্গুল দিয়ে সোহরাওয়ার্দ্দী উদ্যানের আলো-আধারীতে চলাফেরা করা মেয়েগুলোকে দেখিয়ে বলে, 'ওদের আর আমার মধ্যে পার্থক্য কী?'

কোনো উত্তর দেয় না কেউই। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে যুথীর দিকে, যুথীও। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকার পর যুথী বলে, 'ওরা টাকার বিনিময়ে প্রতিদিন খণ্ডকালীন ব্যবহার হয়, আর আমাকে ব্যবহার করা হবে দেনমোহর নামে এক আজীবন চুক্তিতে ফেলে। এই যে এতো আধুনিকতার ভান করি আমরা, সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছার দাবী করি আমরা, কিন্তু মানসিকভাবে আমরা কি এখনো আধুনিক হয়েছি, সভ্য হয়েছি চরমভাবে? মেয়েদেরকে আগে মেরে ফেলা হতো মাটিতে পুতে, পাথর নিক্ষেপ করে কিংবা ছুরি দিয়ে গলা কেটে। মেয়েদের এখন করে রাখা হয়

জীবন্মৃত—প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা করে, এসিড মেরে দগ্ধ করে, পুরুষ আর মেয়েদের মধ্যে আকাশ-পাতাল বৈষম্য রেখে। কেন বলা হয় স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত, কেন বলা হয় না স্ত্রীর পায়ের নিচে স্বামীর বেহেস্ত?'

'এটাই হয়তো কোনো নিয়ম।' পাভেল হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলে।

'মানলাম নিয়ম, কিন্তু নিয়মটা উল্টো হলো না কেন? কেন তালাকের পর আবার দু জন একত্র হতে চাইলে হিল্লা বিয়ে হতে হয়, ওই মেয়েকেই কেন একরাত অন্য পুরুষের ঘরে থাকতে হয়?' যুথী পাভেলের দিকে একপলক তাকিয়ে বলে, 'কেন শাস্তিটা মেয়েদেরই পেতে হবে? এখানে শাস্তি হিসেবে পুরুষকে তো গলা পর্যন্ত মাটিতে পুতে কুকুর দ্বারা গাল চাটাতে পারত কিংবা হিসু করাতে পারত তার মুখ বরাবর অথবা পুরুষের কোনো একটা কান কেটে রাস্তায় ঘুরানোর নিয়ম করতে পারত পুরো একটা দিন। তুই কি মনে করিস নারী এই পৃথিবীতে নিজে ইচ্ছায় এসেছে? আদম অপূর্ণ ছিলেন বলেই তাকে পাঠানো হয়েছে।'

ডাস্টবিনের কাছাকাছি এসে সুশান্ত ওর বা হাতের কোণার আঙ্গুলটা দেখায়। হিসু করবে ও ডাস্টবিনের পাশে দাঁড়িয়ে। যুথী মুচকি হেসে বলে, 'তলপেট ভারী হয়ে গেছে আমারও। কিন্তু তুই পুরুষ বলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে খালি করতে পারিস সেটা, আমরা পারি না তা।'

চৌরাস্তার মোড়ের ছোট খুপরি ঘরের চায়ের দোকানটা সারারাত খোলা থাকে, আজ সেটা বন্ধ। রাস্তার নাইটগার্ডকে দেখে সৌম্য বলল, 'কাক্কু, চা-র দোকানটা আজ বন্ধ যে?'

'ওনায় মইর‍্যা গ্যাছে।'

'কবে?'

'আইজ বিকালে।'

সৌম্যর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ায় যুথী, 'তুই তো এতক্ষণ চুপ হয়ে ছিলি। এবার বল তো—এই অর্থবিত্তহীন চায়ের দোকানদার আর বিত্তের প্রাচুর্যে ঘেরা আমার বাবার মধ্যে মিলটা কোথায়?'

'দুজনই মানুষ।' ছোট্ট করে উত্তর দেয় সৌম্য।

'কিন্তু এ দুজনকেই পৃথিবী ছাড়তে হয়েছে খালি হাতে।' যুথী আকাশের দিকে তাকায়। চাঁদ আছে আকাশে, মেঘে ঢাকা। চাঁদের সেই ম্লান আলোয় নিজের ছায়া খুঁজে পায় না সে, খুঁজে পায় না সে নিজেকেও।

সোনিয়া গান্ধী
সভানেত্রী
কংগ্রেস, ভারত

প্রিয় ম্যাডাম

ক্ষমতা ভালোবাসে মানুষ, স্রষ্টাও। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা তিনি। তিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, বাতাস সৃষ্টি করেছেন, পানি সৃষ্টি করেছেন। গাছপালা, লতাপাতা, ফল-ফুল সব সৃষ্টি করেছেন তিনি। কিন্তু তিনি তার ক্ষমতা প্রকাশ করেন না। খুব নীরবে তার সব সৃষ্টি বয়ে যায়, খুব আপন গতিতে এগিয়ে যায় তার মহিমা, কোথাও কোনো অতি প্রকাশ নেই, নেই কোনো আড়ম্বর।

কিন্তু মানুষ ক্ষমতা প্রকাশ করতে চায়, ক্ষমতার প্রয়োগও করতে চায় সে, যদি সে একবার ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। কিন্তু সদ্য টিন এজ অতিক্রম করা এই আমরা কেবল আপনাকেই দেখেছি। ইতিহাস তেমন পড়া হয়নি আমাদের। ভুল তথ্যে ভরা ইতিহাস, যখন যে ক্ষমতায় থাকে তাকে তুষ্টি করে লেখা তৈল কাহিনী, বিভ্রান্তিকর রূপকথার মতো অতি অলৌকিক গল্প পড়তে ভালো লাগে না আমাদের। আমরা আপনাকে দেখে জেনেছি—ক্ষমতা একবারের হাতের মুঠোয় পেয়েও কীভাবে সেই ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়; জাতীয় স্বার্থে, দেশের স্বার্থে অন্যের হাতে তুলে দিতে হয়, কীভাবে ক্ষমতার লোভ সংবরণ করতে হয়।

আপনি আরো দেখিয়ে দিয়েছেন—বড় কোনো দলের সভাপতি বা সভানেত্রী হলেই সে যে প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্ট হবেন সেটা ঠিক না। আপনাকে দেখে এও মনে হয়—সরলতাই সর্বশ্রেষ্ঠ, সে সরলতা পোষাক-আশাকে, আচরণে, ব্যক্তিত্বেও।

তবে এ কথাটা ঠিক, প্রকাশ্যে না এলেও ক্ষমতার দণ্ডটা আপনার হাতেই ধরা। আপনি যখন খুশি তখন তাকে সেই দণ্ডটা স্পর্শ করাতে পারেন,

যখন খুশি সেই দণ্ডটা সরিয়ে নিতে পারেন। সেই রূপকথার সোনার কাঠি রূপোর কাঠির মতো, কাঠি অদল বদল করলেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায় রাজকন্যার।

খুব সাধারণ একজন গৃহবধু হতে পারতেন আপনি ইটালির কোনো অচেনা পরিবারের। কিন্তু সেই আপনি এখন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতার ব্যক্তি, বিশ্বের তিন-চারজন ক্ষমতাধর নারীরও একজন। এক জীবনে আর কী চাই!

ম্যাডাম, আপনার চাওয়া না থাকতে পারে, আমাদের কিছু চাওয়া আছে। আপনারা ফারাক্কা বাঁধ দিয়েছেন, আমাদের দেশটা আপনাদের পণ্যের বাজারে পরিণত করেছেন, আকাশ সংস্কৃতি দিয়ে গিলে ফেলেছেন আমাদের, এমনকি আমাদের সকালের নাস্তাও শুরু হয় ভারতীয় ডিম দিয়ে। এগুলো নিয়ে কিছু বলার নেই। রাষ্ট্রের কাঠামোগত সমস্যা; পালাক্রমে রাষ্ট্রের ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন যারা তাদের অজ্ঞতা, ভণ্ডামি, শঠতা, পিছিয়ে দিয়েছে আমাদের। কিন্তু নতুন করে তো আপনারা আমাদের বিপদের মধ্যে ফেলতে পারেন না। টিপাইমুখ বাঁধ দিতে চাচ্ছেন আপনারা, আপাতত স্থগিত রেখেছেন, কিন্তু আমরা জানি স্বার্থে আঘাত লাগলেই বাঁধ নির্মাণ করার প্রক্রিয়া শুরু হবে আবার। এই গরিব দেশের মেহনতি অনেক মানুষের পেটে আঘাত দেবেন আপনারা। কিন্তু রূঢ় সত্য হচ্ছে—প্রকৃতি কখনো কোনো অনিয়ম সহ্য করে না। তাই তো বরফ গলে যাচ্ছে, ভূমিকম্পে পৃথিবী দেবে যাচ্ছে, চরম গরম কিংবা ঠাণ্ডায় সব কিছু অসহ্য হয়ে যাচ্ছে, বাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে এ সমস্ত পৃথিবীটা। আরো রূঢ় একটা সত্য হচ্ছে—এ পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকবেন না। না চে গুয়েভারা, না মহাত্মা গান্ধী, না নেলসন ম্যান্ডেলা, এমন কি আপনিও। আমরা সবাই বেঁচে থাকব আমাদের মানবতায়, মনুষ্যত্বে। প্লিজ, আপনার মানবিকতায় আমরাও মানবিক হই। রাহুল-প্রিয়াংকার মতো অকৃত্রিম ভালোবাসার ভাগিদার হতে চাই আমরাও, মায়ের ভালোবাসার, মায়ের মমতাময় ভালোবাসার।

দ্বিতীয় চিঠিটা লিখেই সৌম্য বলল, 'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। এখন আমি ঘুমাব। ঘুমানোর আগে দু চোখ মেলে পাহাড় দেখব, পাহাড়ের গায়ের সবুজ গাছ দেখব, পাহাড় থেকে ওঠা সাদা সাদা ধোঁয়া দেখব।'

'শরীর খারাপ না তো তোর!' বিন্তী এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল সৌম্যর কপালে। সঙ্গে সঙ্গে সৌম্য শব্দ করে বলল, 'আহ, এভাবে যদি সব সময় কপালে কেউ হাত রাখত!'

'কী হতো তাহলে?' বিন্তী হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল।

'ঘুম এসে যেত—।' বিন্তীর হাতটা টেনে নিয়ে আবার নিজের কপালে রেখে সৌম্য বলল, 'এবং সেই ঘুমের মাঝে চুপচাপ মরে যেতে আফসোস হতো না আমার একদমই।'

'মরে গেলে কাজগুলো কে করবে?'

'তুই করবি, যুথী, পাভেল, সুশান্ত করবে।'

'আর তুই?'

'মরে গিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকব অনন্তকাল, আর মাঝে মাঝে উঠে বেহেস্তের ফল খাব, ভালো ভালো খাবার খাব।' খুব আনন্দ নিয়ে বলল সৌম্য, 'শুধু ঘুমাতাম আর খেতাম।'

বিছানায় বসে একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল যুথী। ঘুরে তাকিয়ে ও বলল, 'তুই সিওর, মরার পর তুই বেহেস্তে যাবি?'

'একশ পার্শেন্ট সিওর। যে কাজটা করব বলে ভেবেছি আমরা, সেই কাজটা যদি করতে পারি, আমি জানি—জীবনে ছোট বড় যত পাপ করেছি তার সব মাফ হয়ে যাবে আমাদের। বেহেস্ত তখন ঠেকায় কে!'

'আমাদের পাঁচজনেরই মোবাইল বন্ধ, কারো একজনের মোবাইল ওপেন করা দরকার।' কী একটা লিখছিল পাভেল, লেখা বন্ধ করে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল ও।

'কেন?' যুথী বিরক্তি নিয়ে বলল।

'বাসা-বাড়ি, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হলে চলে!' পাভেল কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল।

বিছানা থেকে উঠে বসে পাভেলের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল যুথী, 'তোর কি বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে?'

'আমি কি সেটা বলেছি?'

'কিন্তু তোর কথা শুনে তো তাই বুঝা যাচ্ছে।'

'মোটেই সেটা বুঝার কথা না। যুথী শোন—।' যুথীর কাঁধে আলতো করে একটা হাত রেখে পাভেল বলল, 'আমি আকাশ দেখি না, সেটা সবাই দেখে, আমি আকাশের পরের আকাশ দেখি। সমুদ্র দেখব বলে আমি সমুদ্রের কাছে যাই না, মানুষ আমরা যে কত ক্ষুদ্র সেটা বোঝার জন্য সমুদ্রের সঙ্গে নিজেকে মেলাই। ছায়ায় শীতল হওয়ার জন্য আমি বটবৃক্ষের নিচে গিয়ে দাঁড়াই না, কতটুকু উদার হলে সমস্ত অঙ্গ প্রসারিত করে ছায়া দেওয়া যায়, বটবৃক্ষের কাছে আমি সেই উদারতা শিখি।'

'তোকে না মাঝে মাঝে আমার খুব জটিল মনে হয়।'

'আমারও, নিজেকে আমারও মাঝে মাঝে জটিল মনে হয়।' পাভেল হাসতে হাসতে বলল, 'এই যেমন বাবা প্রায়ই বলতেন, তোর কাছে একটা জিনিস চাওয়ার আছে রে, পাভেল। আমি বলতাম, কী?

আমাকে একটু সঙ্গ দে তো, একা একা ভালো লাগে না আর।

তুমি বরং আরেকটা বিয়ে করো, বাবা। সাজেস্ট করি আমি বাবাকে, মা মারা গেছে অনেকদিন হলো, নতুন কেউ পাশে থাকলে ভালোই লাগবে তোমার।

সেটা কি ঠিক হবে? দ্বিধাজনিত গলায় বাবা বলেন।

অঠিকের কী আছে?

এই বয়সে—। থেমে যান বাবা।

বিছানায় বসেছিলেন বাবা, পাশে গিয়ে বসি তার। একটা হাত চেপে ধরে বলি, কতইবা বয়স হয়েছে। তোমার বয়সে অমিতাভ বচ্চন এখনো তার মেয়ের বয়সী মেয়ের সঙ্গে নাচে, হাত ধরে বেড়ায়, এমনকি দু-একটা প্রেমের গানও গায়।

ওগুলো তো অভিনয়?

বাবা—। বাবার একটা হাত চেপে ধরে বলল, আমরাও কি প্রতিদিন অভিনয় করছি না, প্রতিদিন বেঁচে থাকার অভিনয় করছি না!'

যুথী পাভেলকে নরম গলায় বলে, 'তোর বাবা খুব ফ্রেন্ডলি ছিলেন, না?'

'খুব।'

'তোর বাবা কি পরে বিয়ে করেছিলেন?'

বেশ কিছুক্ষণ থেমে থেকে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল পাভেল। যুথীর একেবারে চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সব তো একদিনে বললেই চলবে না। আপাতত এটুকুই থাক। বাকীটুকু অন্য কোনো একদিন বলব।' হাসতে থাকে পাভেল।

রুমের ভেতর মোবাইল বেজে ওঠে হঠাৎ। চুপচাপ এতক্ষণ বসে ছিল সুশান্ত। লাফ দিয়ে উঠে ব্যাগের পকেট থেকে ওর মোবাইলটা নিয়ে রিসিভ করে কলটা। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই, প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কারো মোবাইল খোলা রাখার কথা না। সুশান্তের সেদিকে খেয়াল নেই, কিছুটা হাঁপাতে হাঁপাতে ফোনটা কানের কাছে নিয়ে বলে, 'হ্যালো। কে, মা?'

'কেমন আছিস, বাপ?' খুব কাতর গলায় বলেন সুশান্তের মা।

'আমি ভালো আছি। বাবা কেমন আছে, মা?'

'ভালো না। তোর বাবার বুকের ব্যথাটা বেড়েছে।'

'ওষুধ খাচ্ছে না, বাবা?'

'না।'

'কেন!'

'জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না। একবার পানি আর ওষুধ দিলাম, রাগ করে ফেলে দিল।'

'ডাক্তার ডেকে আনো না!'

'এখানে তো এলামই নতুন। কোথায় কোন ডাক্তার থাকে তাতো জানি না। তাছাড়া ডাক্তারের কথা তোর বাবাকে একবার বলেছিলাম, রাগ করে আমার দিকে একবার এমনভাবে তাকাল, তারপর আর বলার সাহস হচ্ছে না।'

'দাদাকে খবর দিয়েছো?'

'ওকে খবর দিব কীভাবে! সেই কোন সকালে বাসা থেকে বের হয়েছে, এখনো ফেরেনি।'

'দাদাকে একটা মোবাইল নিতে বলো না।'

'বলেছিলাম। বলল, নতুন এলাম, আগে কামাই-রোজগার শুরু করি তারপর দেখা যাবে।'

'বাবাকে একটু দেবে?'

'মনে তো হয় না কথা বলবে। কাল শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে যায় আমার। দেখি তোর বাবা ঘুমের মধ্যে তোর নাম নিচ্ছে আর কাঁদছে। মানুষটা সম্ভবত বেশি দিন আর বাঁচবে না রে।'

'কেঁদো না তো!'

'কাঁদব না তো কী করব। তুই ওখানে রয়ে গেলি, আর আমরা সবাই চলে এলাম। কাজটা কি ঠিক হলো?'

'আমি ঠিক করেছি মা, তোমরা ভুল করেছ। এ দেশটা আমার, এ দেশের মাটি আমার, এ দেশের গাছ আমার, নদী আমার, সবুজ ঘাস আমার, আকাশ-বাতাস—সব আমার। আমি কেন আমার দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাব। আমি কেন অন্য দেশে গিয়ে কেঁচোর মতো হেঁটে বেড়াব। মা, তুমি সত্যি করে বলো তো—ওই দেশে গিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে

পারছো তুমি, আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে করতে পারছো আকাশটাকে, ওখানকার পাখিগুলো তোমার ভালো লাগে, আপন মনে হয় চারপাশের সব কিছু? প্লিজ, মা তুমি কাঁদবে না। আমি ভালো আছি মা। এখানে আমি সত্তর বছর না খেয়ে থাকব, আমার কোনো ক্ষুধা লাগবে না মা। মাটিতে বুক পেতে শুয়ে থাকব, কোনো কষ্ট হবে না আমার। এখানকার সবকিছু আমার মুখের মতো প্রিয়, আমার হাতের তালুর মতো আপন, আমার চোখের মতো প্রয়োজনীয়। না মা, আমি কোনো দুঃখে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি আনন্দে। এ দেশে থেকে যাওয়ার আনন্দে, এ দেশকে ভালোবাসতে পারার আনন্দে।'

'একবার আসবি না কলকাতায়?'

'আসব, তোমাকে দেখতে আসব মা। তুমি নাই, প্রতিটা দিন কী যে শূন্যতায় কাটে আমার!'

'তোর বাবাকে দেখতে আসবি না?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে সুশান্ত। মার কথার কোনো জবাব দেয় না। কান থেকে মোবাইলটা সরিয়ে এনে সুইচটা অফ করে ফেলে। তারপর সেটা ছুড়ে ফেলে দেয় বিছানার ওপর।

জানালা দিয়ে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সুশান্ত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। পাহাড়ের ধোঁয়ার দিকে ভালো করে তাকাতেই উত্তমের কথা মনে পড়ে যায় ওর। উত্তম ওর সাথে পড়ত, ক্লাসে সব সময় ওর রোল থাকত ছয়।

খুব ভালো নাচতে পারত উত্তম। দুর্গা পুজার সময় ও সিরাজগঞ্জের প্রতিটা পুজোমণ্ডপের সামনে নাচত, কী যে সুন্দর করে নাচত! তখন মিঠুন চক্রবর্তীর ডিসকো ড্যান্সার সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। সে বছর দুর্গা পূজার মণ্ডপের সামনে উত্তম একটি নাচই নাচত, যেমনটা মিঠুন নাচত ডিসকো ড্যান্সারে—আই অ্যাম এ ডিসকো ড্যান্সার...। সুশান্তরা মুগ্ধ হয়ে দেখত, মিঠুনের নাচ আর উত্তমের নাচের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। হুবহু এক—একইরকম পা নাচানো, কোমর দোলানো, শরীর বাঁকানো।

আরো একটা জিনিস উত্তম খুব ভালো পারত—ঘুড়ি ওড়ানো। স্কুল থেকে ফিরে পঙ্কজ চৌধুরীর ছাদে উঠে সেই যে ঘুড়ি ওড়ানো শুরু করত, শেষ করত সেই সন্ধ্যায়। এরই মধ্যে আশপাশ থেকে ওড়ানো অনেক ঘুড়ি ও কেটে দিত দক্ষ কসাইয়ের মত। কী যে আনন্দ হত!

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল উত্তমের বড় ভাই গৌতম মুসলমান হয়ে গেছে। ওর নাম এখন ওমর ফারুক। ওদের স্কুলের এক শিক্ষকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে ও।

নয়দিন পর স্কুলে এসে সুশান্ত শোনে, উত্তমরা আর এ দেশে নেই, বাবা-মাসহ ইন্ডিয়ায় চলে গেছে ওরা। কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করেনি ও। উত্তমরা যে বাসায় ভাড়া থাকত সেখানে গিয়ে দেখে, ওরা নেই, রাতের আঁধারে ইন্ডিয়ায় চলে গেছে ওরা। বুকের ভেতর কেঁপে উঠেছিল ওর। যে উত্তমের সঙ্গে একই বেঞ্চে বসত, এক সঙ্গে ওসমান ভাইয়ের চানাচুরের দোকান থেকে আচার মাখা চানাচুর কিনে খেত, বিশ্বনাথের কাছ থেকে লাল টকটকে আইসক্রিম খেতে খেতে স্কুল থেকে বাসায় ফিরত—সেই উত্তম চলে গেল! তাকে না বলে চলে গেল। সারাটা দিন সেদিন এখানে ওখানে ঘুরেছে সুশান্ত, কোনো কিছু ভালো লাগেনি, বুকের ভেতর একটুর পর পর ধুক ধুক করে উঠেছে তার।

বুক খালি করা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সুশান্ত জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়ায়। সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'বলতে পারিস এ দেশ থেকে অধিকাংশ হিন্দু রাতের আঁধারে দেশ ছেড়ে যায় কেন?'

'তোর এ প্রশ্নটার আগে যে প্রশ্নটা করা উচিত—রাতের আঁধারেও না, দিনের বেলাতেও না, তারা আসলে দেশ ছেড়ে যায় কেন?' সৌম্য সুশান্তের দিকে তাকিয়ে বলল।

'এটা তো সবাই জানে।' সুশান্ত কিছু বলার আগেই পাভেল কিছুটা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'তারা আসলে এ দেশটাকে নিজের দেশ ভাবে না, তারা নিজের দেশ ভাবে ইন্ডিয়াকে।'

'কথাটা কি ঠিক হলো?' বিন্তী ঠিক প্রশ্ন করে না, মতামত জানতে চায় সবার।

'কথাটা ঠিক কি না আমি জানি না।' সুশান্ত খুব শান্ত স্বরে বলল, 'যারা দেশ ছেড়ে যায়, তারা সবাই কি ইন্ডিয়াকে নিজের দেশ ভাবে?'

'সেটা নাও ভাবতে পারে।' যুথী সুশান্তের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'তবে আমাদের এলাকার অধিকাংশ হিন্দু মহিলাদের দেখতাম ইন্ডিয়ায় বেড়ানোর নাম করে হাত-নাক-গলায় যতগুলো সম্ভব সোনার জিনিসপত্র লাগিয়ে নিয়ে যেত, কিন্তু দেশে ফিরে আসত খালি হাত-পা-গলায়।'

'এটা তো এক ধরনের সম্পদ পাচার।' পাভেল আগের চেয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'এটা দেশদ্রোহীতার শামিল।'

'না, এটাকে দেশদ্রোহীতার শামিল বলে না।' সৌম্য পাভেলের দিকে তাকিয়ে বলে।

'এই শ্রেণীর হিন্দুরাই ভারতকে নিজের দেশ ভাবে।' সুশান্ত একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি আবারও বলি, কিন্তু পালিয়ে যাওয়া সব হিন্দুই ভারতকে নিজের দেশ ভাবে না।'

'হয়তো কেউ কেউ নিরাপত্তার কথা ভেবে—।' সৌম্য কথাটা শেষ করে না। মাথাটা চেপে ধরে বলে, 'আমার মাথায় আসলে এসব ঢোকে না।'

'কিন্তু তোর মাথায় এসব ঢোকা উচিত, কারণ তোর বাবা এ দেশের একজন ঝানু রাজনীতিবিদ। নিরাপত্তার কথা বলছিস? এ দেশে কোন মানুষটা নিরাপদ? এ দেশে সাধারণ মানুষ নিরাপদ না, পুলিশ নিরাপদ না, কোনো রাজনীতিবিদ নিরাপদ না, কোনো মুসলমানও নিরাপদ না। সেখানে আলাদাভাবে হিন্দুদের কথা আসছে কেন? কই, ভারতে কি কেউ নিরাপদ? ওখান থেকে কোনো মুসলমান বাংলাদেশে পালিয়ে আসে না কেন?' পাভেল কিছুটা চিৎকারের মতো করে বলে, 'আসল কথা ওইটাই—দেশকে নিজের করে ভাবা, আপন করে ভাবা।'

'বাদ দে তো এসব নোংরা পলিটিক্সের কথা।' সৌম্য বিরক্তি নিয়ে বলল, 'ঘৃণা লাগে এসব কথা ভাবলে।'

'এসবকে নোংরা পলিটিক্স বলছিস তুই, কিন্তু তোর বাবাও কিন্তু এসব নার্সিং করে ক্ষমতায় যেতে চায়, ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়।' পাভেল চেহারাটা কঠিন করে বলে, 'শোন, সুশান্তদের সিরাজগঞ্জের একটা ঘটনা শোনাই। বিপুল পাল নামে একজন হিন্দু ছিলেন। ছিলেন মানে কি এখনো আছেন। তিন ভাই তারা। সিরাজগঞ্জে তাদের হাঁড়ি-পাতিলের দোকান। এক ভাইকে ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দিয়ে ওখানে আস্তে আস্তে টাকা পাঠাতে থাকে তারা, উদ্দেশ্য একদিন সবাই ভারতে চলে যাবে। ওই ভাইটি বাংলাদেশ থেকে পাঠানো টাকায় ওখানে জায়গা কেনে, বাড়ি বানায়, তিনটা ট্রাক কেনে। কিন্ত সব করে নিজের নামে। একদিন ও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়, ও আর যোগাযোগ রাখে না বাংলাদেশে থাকা ভাই-বোন-বাবা-মা কারো সঙ্গে। বিপুল পালদেরও আর চলে যাওয়া হয় না ইন্ডিয়ায়। ব্যাপারটা ওই এলাকার সবাই জানে। পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এ দেশ থেকে অনেক কিছু

পাচার করা হয় ওই দেশে, এটা জেনেও সিরাজগঞ্জের ওই এলাকার সবাই কিছু বলেনি বিপুল পালদের। ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করা যেত ওদের, যারা এ দেশে থেকে এখনো ভারতকে নিজের দেশ ভাবে।'

'এর ভেতর তো ব্যতিক্রমও আছে।'

'হ্যাঁ, সুশান্ত আছে। এজন্য আমরা এখনো বিশ্বাস হারাইনি। আমরা কতিপয় মানুষ এখনো তাই এ দেশে কোনো হিন্দুকে সমস্যায় পড়লে এগিয়ে যাই, ওদেশে কোনো মুসলমান বিপদে পড়লে কিছু হিন্দু এগিয়ে আসে।'

সুশান্তের চোখ টল টল করছে, 'সব কিছুই ঠিক আছে, সব কিছুই বুঝিস তোরা। কেবল এই জিনিসটা কখনো বুঝবি না–দেশ ছেড়ে যাওয়া যে কী কষ্টের, নিজের আবাস ছেড়ে যাওয়ার যে কী যন্ত্রণা, নিজের মাটি গায়ে মাখতে না পারার কী যে দহন!' সুশান্ত একটু থেমে বলে, 'মা বেঁচে আছেন, অথচ সেই মাকে কাছে না পাওয়ার কী তীব্র হাহাকার! পৃথিবীর সমস্ত কিছুর বিনিময়েও সেটা কখনো বুঝবি না তোরা, কোনোদিনই না।'

ওয়েন জিয়াবাও
প্রধানমন্ত্রী
বেইজিং, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন

মহাত্মন

ক্রমেই বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে আপনার দেশ, আপনাকে অভিনন্দন। আপনাকে আরো অভিনন্দন মাত্র কয়েকদিন আগে জাপানকে পেছনে ফেলে আপনার দেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে নিয়ে গিয়েছেন বলে। সামনে এখন শুধু আমেরিকা। আশারাখি, অল্প কয়দিনের মধ্যে সেটাকেও পেছনে ফেলে দেবেন আপনি।

আপনি কি জানেন—আমাদের ঘুম ভাঙে এখন চীনের জিনিসের শব্দে। আমাদের যাদের বাসায় টেবিল ঘড়ি আছে, যারা ঘুম ভাঙার জন্য ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে থাকি, সেই অ্যালার্ম সমৃদ্ধ প্রায় প্রতিটা ঘড়িই হচ্ছে চীনের তৈরি। যাদের ঘড়ি নেই অথচ সংসার আছে তাদের ঘুম ভাঙে কোনো ননস্টিকি ফ্রাইপ্যান, চামচ, প্লেট কিংবা অন্য কোনো আসবাবপত্রের শব্দে। আর এ সবই হচ্ছে চীনের তৈরি। আমাদের দুপুর কাটে চীনের জিনিসে, বিকেল কাটে চীনের জিনিসে, রাতও কাটে চীনের জিনিসে। আমাদের অফিস চীনের জিনিসে ভরপুর, বাসা চীনের জিনিসে পরিপূর্ণ, আমাদের শরীরও চীনের জিনিসে মোড়ানো। মোট কথা আমাদের প্রতিটি দিন এখন চীনময়। আগে আমরা ভুটানের কমলা, অস্ট্রেলিয়ার কমলা, ভারতের কমলা খেতাম। নেটের মধ্যে বাঁধাই করা ছোট ছোট কমলা খাচ্ছি আমরা ইদানীং, খুবই মিষ্টি। সব দেশের কমলাকে পেছনে ফেলে এখন সবাই এটাই খাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সেই কমলাগুলো আপনার দেশ থেকেই আসে।

সারা বিশ্ব এখন চীনের হাতের মুঠোয়, সব কিছু এখন তার চীনের ধরা-ছোঁয়ায়। আপনি আর কী চান? একজন রাষ্ট্রনায়ক হয়ে আর কী বাকী আছে আপনার আওতায় আনতে? যা কিছু বাকী আছে, অল্পদিনের মধ্যে

তা পেয়ে যাবেন আশারাখি।

গাছ বড় হয়ে গেলে সেটা ছায়া দেয়, সেটা আবার তার আশপাশের গাছগুলোকে তেমন বাড়তে দেয় না, মেরে ফেলে। সেজন্যই কি তিব্বতের দালাইলামা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? শান্তিতে নোবেল পাওয়া এই মানুষটাকে কেন অশান্তিতে রেখেছেন? তাকে কেন এতো ভয় আপনাদের? জেনে রাখুন মিস্টার, দুইশ বছর শাসন করেও ব্রিটিশদের একদিন পালিয়ে যেতে হয়েছিল, সব দেশকেই একদিন না একদিন স্বাধীনতা দিতে হয়েছে তাদের! কোথায় এখন ব্রিটিশ রাজ্য? আমেরিকার লেজুড়বৃত্তি করে বেঁচে আছে তারা এখন। এক সময়ের সম্রাটের এখন মোসাহেবি করে জীবন চলে! নিয়তির কী নির্মম পরিহাস! সুতরাং তিব্বত একদিন স্বাধীন হবে, তাইওয়ানও একদিন ঘুরে দাঁড়াবে। বাংলাদেশকে যেমন আটকাতে পারেনি পাকিস্তান।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, এক সময়ের সমাজতান্ত্রিক দেশটা ক্রমান্বয়ে সবচেয়ে ধনতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে, এতে কোনো দুঃখ নেই। দুঃখ হচ্ছে—একলা চলার দাম্ভিক নীতিতে আপনারা না একদিন সত্যি সত্যি একলা হয়ে যান। আর একবার একা হয়ে গেলেই বনের বাঘের মতো অনেকে হামলে পড়বে আপনাদের উপর। ভুল হলে হজম হয়ে যাবেন, যেমন হজম হয়ে গেছে বিশ্বের বৃহত্তর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া। জীবনটা অনেক বেশি ঠুনকো, যেমন ঠুনকো চীনের সব জিনিসপত্র—ভঙ্গুর, অটেকশই, ফেলনা।

সৌম্যর আগে ঘুম ভাঙত ঘড়ির অ্যালার্মে, তারও আগে যখন গ্রামে ছিল তখন পাখির ডাকে, কিছুদিন আগে ভাঙত মায়ের চিৎকারে। সকালে ঘুম ভাঙার পর তার প্রথম কথাই ছিল—ওই ছেমড়ি ওঠ। বেডরুমের বিশাল খাটের নরম গদিতে গরমের দিনে এসি ছেড়ে, শীতের দিনে পাখির পালকের লেপ গায়ে চেপে, ড্রইংরুমের মেঝের কার্পেটে শোওয়া কাজের মেয়েকে ডাক দিতেন তিনি এভাবে, বেডরুমের খাটেতে শুয়েই।

সৌম্যর মায়ের নাম তানিয়া সৈয়দ, সৈয়দ বংশের মেয়ে তো! কাজের মেয়ের নাম পুতলি। প্রথম ডাকে পুতলি না উঠলে তানিয়া সৈয়দের পরের বাক্যটা হলো—ওই কুত্তার বাচ্চা উঠিস না কেন! আমি উঠলে কিন্তু গরম পানি ঢেলে দেব গায়ে।

কাজের মেয়ের গায়ে গরম পানি ঢালার অভ্যাস তানিয়া সৈয়দের আছে, অনেক আগে থেকেই আছে। উনিশ বছর আগে তিনি প্রথম গরম পানি ঢালেন ছন্দা নামে একটা কাজের মেয়ের গায়ে। ওর গায়ের রঙ ছিল

কালো কুচকুচে, রেগে গেলেই তানিয়া সৈয়দ ওকে তাই ডাকতেন পেত্নি বলে। ছন্দার খুব খারাপ লাগত ডাকটা শুনে, কিন্তু কিছু বলত না সে।

বাইরে গেছেন একদিন তানিয়া সৈয়দ। ছন্দাকে বলে গেছেন ভাত রান্না করে রাখতে আর ঘরের সব কাজ শেষ করতে। তিন ঘণ্টা পর বাসায় ফিরে তিনি দেখেন সব কাজ ঠিক মতো করেছে ছন্দা, কেবল ভাত রান্না ছাড়া। ভাত জাউ ভাতের মতো নরম হয়েছে। চট করে মাথায় আগুন ধরা স্বভাবের তানিয়া সৈয়দের মাথায় আগুন ধরে যায় ওই মহূর্তে। চিৎকার করে তিনি ডাক দেন, 'ছন্দা!'

দৌড়ে আসে ছন্দা।

'ভাতের এ অবস্থা কেন?'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ছন্দা। দু চোখে ভয়, কোনো কথা বলে না সে। কেবল তাকিয়েই থাকে।

'কথা বলছিস না কেন?' দাঁত চেপে বলেন তানিয়া সৈয়দ।

ছন্দা তাকিয়েই থাকে, ফ্যালফ্যাল তাকানি।

বাম গালে ডান হাত দিয়ে একটা থাপ্পড় মারেন তানিয়া সৈয়দ। পুরো সাড়ে চার ইঞ্চি চওড়া হাতের থাপ্পড়টা খেয়ে শরীরে মাংসবিহীন ছন্দা চিৎ হয়ে পড়ে যায় মেঝের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে একটা লাথি। পেন্সিল হিলের গোড়ালি দেবে যায় ছন্দার পিঠের মাঝ বরাবর, 'বল, ভাতের এ অবস্থা কেন?'

বারো বছরের ছন্দা কোনোরকমে ওঠার চেষ্টা করে মেঝে থেকে। তানিয়া সৈয়দ হাত টেনে ধরে বলেন, 'ভাত রাধতে দিলেই তুই এমন করিস। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।' পাশ থেকে ফ্রাইপ্যানের হাতলটা নিজের হাতে নেন তিনি, 'বল, ভাতের এ অবস্থা কেন?'

কাঁপতে কাঁপতে ছন্দা বলে, 'কাজ করতে ছিলাম।'

'কাজ করতে ছিলি তাই কী?'

'চুলায় ভাত ছিল ভুলে গেছিলাম।'

'ভুলিস কেন?' ফ্রাইপ্যান দিয়ে পিঠে একটা আঘাত করে তানিয়া সৈয়দ চিৎকার করে ওঠেন, 'প্রায়ই দিনই তুই ভুলে যাস। আজ তোকে ভুলে যাওয়া দেখাচ্ছি।' টেবিলের ওপর ফ্লাস্ককে গরম পানি ছিল, সেটা খুলে তিনি ঢেলে দেন ছন্দার মাথার ওপর। কটকটে গরম পানি, ছন্দা একটা চিৎকার দিয়েই অজ্ঞান হয়ে যায়।

তানিয়া সৈয়দ দ্বিতীয়বার গরম পানি ঢালেন শিপু নামের একটা কাজের মেয়ের মাথায়। শিপুর বয়স ছিল নয় বছর। সৌম্যদের বাসায় আসার তৃতীয় দিনেই চুরি করে খায় শিপু। বড় কিছু চুরি না, এক টুকরো আলু চুরি। কিচেনে তরকারি ছিল, সেখান থেকে একটা টুকরা টুপ করে মুখে দেয় সে। সঙ্গে সঙ্গে কিচেনে ঢোকেন তানিয়া সৈয়দ, দেখে ফেলেন ব্যাপারটা। খুব কষ্টে হজম করেন তিনি, সম্ভবত প্রথম বলে।

শিপু দ্বিতীয়বার চুরি করে এক টুকরো মুরগির মাংস। সেদিন একটা থাপ্পড়ের ওপর দিয়ে বেঁচে যায় সে। তৃতীয় বার চুরি করে একটা আপেল, চতুর্থবার ফ্রিজ থেকে মিষ্টি, পঞ্চমবার করে অর্ধেক একটা কমলা। এ কয়েকবার চড়-থাপ্পড়ই খেয়েছে, কোনো কোনো দিন দু-একটা রুটি বানানোর বেলুনের বাড়ি।

ষষ্ঠবার শিপু অভিনব কায়দায় চুরি করে। ড্রইংরুমের মেঝের কার্পেটে ঘুমিয়েছিল ও। তানিয়া সৈয়দ কিচেনে পানি গরম দিয়ে ওকে ডাকার জন্য ড্রইংরুমে যান এবং ডেকে তোলেন তাকে। শিপু উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার ওপর তাকাতেই চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে এসে একটা কিছুর ওপর পা চাপা দেয় সে। ব্যাপারটা তানিয়া সৈয়দ দেখে ফেলেন। ঘুমজড়িত গলায় তিনি বলেন, 'পায়ের নিচে কী লুকালি?'

শিপু ঝট করে বলে, 'কিছু না।'

'পা সরা।'

পা সরায় না শিপু।

সাত সকালে চিৎকার করে ওঠেন তানিয়া সৈয়দ, 'বললাম না পা সরা। দেখি, তোর পায়ের নিচে কী?' শিপু পা সরানোর আগেই ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন তিনি। একটা আঙ্গুর পড়ে আছে মেঝেতে, কালো আঙ্গুর।

চোখ বড় বড় হয়ে যায় তানিয়া সৈয়দের। রুক্ষ গলায় বলেন, 'এটা এখানে এল কীভাবে?'

শিপু আগের মতোই ঝট করে বলে, 'জানি না।'

'তুই জানিস না, না? আমরা ঘুমানোর পর ফ্রিজ থেকে অনেকগুলো আঙ্গুর নিয়েছিলি তুই, বিছানায় শুয়ে চুপিচুপি খাচ্ছিলি, হঠাৎ একটা আঙ্গুর বিছানায় পড়ে যায়, যেটা টের পাসনি তুই।' পুরো সাত-মিনিট বেদম প্রহার করার পর চুলো থেকে গরম পানিটুকু নিয়ে সরাসরি ঢেলে দেন ওর গায়ে। ভাগ্যিস, মাথায় ঢালতে পারেননি। পিঠে পড়েছিল পানিটুকু। চামড়া পোড়ার

ব্যথায় শিপুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় আশপাশের অনেকের।

তানিয়া সৈয়দের শেষ শিকার ছিল ফুলি। ওর বয়সও খুব বেশি না, বারো কি তের। একেবারেই লিকলিকে শরীর। সেদিন বাসায় অনেক মেহমান এসেছিল। কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল ফুলি। রাতে ডিনার সেটটা ধুতে নিতেই একটা প্লেট হাত থেকে পড়ে যায় তার। তানিয়া সৈয়দ দৌড়ে কিচেনে চলে আসেন। মেঝেতে পড়ে থাকা টুকরো হয়ে যাওয়া প্লেটটা দেখেই যথারীতি হাতে ফ্রাইপ্যানটা তুলে নেন তিনি। আঘাত করেন ফুলিকে, ফুলি সেই আঘাত ঠেকানো চেষ্টা করে হাত দিয়ে। প্লেটটা মেঝেতে পড়ে গিয়ে কয়েক টুকরা হয়ে গিয়েছিল, ফ্রাইপ্যানের আঘাতে ফুলির হাত হয়ে গেল দু টুকরা। কিন্তু ফুলি কোনো শব্দ করল না। কবজির নিচ থেকে ঝুলে যাওয়া হাতটা নিয়ে সৌম্যের ঘরে এসে বলে, 'ভাইয়া, হাতটা একটু বাইন্ধ্যা দেবেন, খুব ব্যথা করতাছে।'

সৌম্য টের পেল চোখে পানি এসে গেছে তার। এ রকম একটা মেয়েকে এভাবে কেউ আঘাত করে। অপরাধবোধে ছেয়ে যায় বুকের সমস্ত অংশ। মেয়েটাকে নিয়ে সোজা চলে থানায়, তারপর হাসপাতালে।

পরের দিন পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে তানিয়া সৈয়দকে। শিশু গৃহপরিচারিকার অধিকার রক্ষা নামক একটা সেমিনারে তিনি তখন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

রাতেই বিশেষ ক্ষমতাবলে থানা থেকে বাসায় চলে আসেন তানিয়া সৈয়দ। সৌম্যের রুমে ঢুকে বলেন, 'এখনই বাসা থেকে বের হয়ে যা।'

টেবিলে বসে কী একটা কাজ করছিল সৌম্য, ঘুরে মায়ের দিকে তাকায়, 'কেন?'

'তোর কাছে তোর মায়ের চেয়ে কাজের মেয়ের মূল্য বেশি।'

'না, আমার কাছে মানুষের মূল্য বেশি। কাজের মেয়েরাও মানুষ।'

'তুই তাহলে ওই কাজের মেয়ে নিয়েই থাক, আমাদের সঙ্গে থাকার দরকার নেই তোর। বাসা থেকে বের হয়ে যা তুই এখনই।'

'তুমি কি মনে করো এ বাসা থেকে বের হয়ে গেলে আমি বাঁচব না?'

'বাঁচবি, না মরবি সেটা তুই জানিস।'

'হ্যাঁ, সেটা আমি জানি। কিন্তু এটা জানি না—শিশু গৃহপারিচারিকার অধিকার রক্ষার জন্য যিনি সারাদিন এখানে ওখানে ছুটে বেড়ান, তাদের কথা বলতে গিয়ে যিনি কেঁদে ফেলেন, তিনি কীভাবে নিজের বাসার শিশু

কাজের মেয়েকে মারেন, মেরে হাত ভেঙে ফেলেন!' সৌম্য একটু থেমে বলে, 'আমার দুর্ভাগ্য তুমি আমার মা। তোমরা যারা সেবার নামে এটা ওটা প্রতিষ্ঠান খুলে বসো, সভা-সেমিনার যত টাকা খরচ করো, যেসব দামী গাড়িতে চড়ো, তা দেখে আমাদের লজ্জা হয় মা, ভীষণ লজ্জা হয়। আই হেইট ইউ, অল।'

'আই হেইট ইউ, অল।' চিৎকার করতে করতে ঘুম থেকে ওঠে সৌম্য। পাশের সিট থেকে বিন্তী দৌড়ে এসে বলে, 'এই, কী হয়েছে রে?'

ঘড়ির অ্যালার্মে না, পাখির ডাকেও না, এমন কি মায়ের চিৎকারেও না, সৌম্যের এখন ঘুম ভাঙে ওই স্বপ্নটা দেখে। স্বপ্নের ভেতর সবাইকে সে আই হেইট ইউ বলে, তারপর ঘুম ভেঙে যায় তার।

'বললি না, কী হয়েছে তোর?'

সৌম্য ছোট্ট করে বলল, 'কিছু না।'

'তাহলে ওভাবে ঘুম থেকে উঠলি কেন?'

'এমনি।'

যুথী খুব মনোযোগ দিয়ে কী যেন লিখছিল। লেখাটা শেষ করে ও ফিরে তাকায়। তারপর বিছানা থেকে নেমে খুব ধীরে-সুস্থে সৌম্যর কাছে গিয়ে বসে বলল, 'কথাটা তুই ভুলে যা, সৌম্য।'

'সম্ভব?'

'চেষ্টা তো কর।'

'করেছি।'

'আরো একটু কর।'

'আমি মেনে নিতেই পারি না বাংলাদেশের অধিকাংশ এনজিও কোনো কাজ করে না। তারা প্রজেক্ট তৈরি করে, ফান্ড কালেক্ট করে, তারপর ফান্ড দিয়ে দামী দামী গাড়ি কেনে, তাতে চড়ে বেড়ায়, বাকী টাকাগুলো নিজেরা ভাগাভাগি করে নেয়।'

'খুব সত্য কথা।' যুথী সৌম্যর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল।

'আমাদের একটা কিছু করা দরকার, খুব দ্রুত করা দরকার।'

'তার জন্য তো আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

'কিন্তু আমার আর দেরি সহ্য হচ্ছে না।'

'আর কয়েকটা দিন বন্ধু, আমাদের পরিকল্পনা শেষ, প্রস্তুতিও শেষ। আশারাখি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভালো কিছু করতে পারব আমরা।' যুথী সান্তনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে।

'সম্ভবত আমরা অনেক দেরি করে ফেলেছি, যুথী।'

'দেরি হতে পারে, কিন্তু সময় কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি।'

'দেশে এতো কিছু হয়েছে, এতো কিছু হচ্ছে, কিন্তু কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই।' রাগে লাল হয়ে গেছে সৌম্যর চেহারা।

'মাথা থাকলে তো ব্যথা করবে।'

'কিন্তু সবার কী বড় বড় কথা, দেশপ্রেমিক সেজে কী চমৎকার অভিনয়, কী নির্লজ্জ খোলস, কী ভণ্ডামির মুখোশ।' সৌম্য চিৎকার করে উঠে বলল, 'তুই বিশ্বাস কর যুথী, এ দেশের কিছু হবে না, এ দেশের মানুষের কোনো উন্নতি হবে না। খারাপ মানুষে ভরে গেছে সব কিছু। আমি সহ্য করতে পারছি না রে। বুক বন্ধ হয়ে আসে আমার।'

শব্দ হতেই দরজার দিকে ঘুরে তাকায় ওরা। বিন্তী উঠে দরজা খুলে দেয়। পাভেল আর সুশান্ত ঢোকে রুমে। যুথী খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, 'খবর কী?'

সুশান্ত মৃদু হেসে বলে, 'খবর ভালো।'

'জিনিসগুলো কবে পাব আমরা?'

'দু-তিন দিনের মধ্যেই পেয়ে যাব।'

'তার মানে আমাদের আরো দু-তিন দিন থাকতে হবে এখানে।'

'আরো দু-এক দিন বেশিও লাগতে পারে।'

'আমি ভাবছি অন্য একটা কথা।' পাভেল জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'জিনিসগুলো নিয়ে যেতে ধরা পড়ে যাবো নাতো?'

'ধরা পড়ে গেলে আমাদের কাজটা ওখান থেকেই শুরু হবে, ওখান থেকেই সব ছারখার করা শুরু করব।' হাত মুষ্টি করে যুথী, চেহারাটাও কঠিন করে ফেলে ও। না, মেয়েরা দুর্বল, এ মুহূর্তে ওকে দেখে তা মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না কারো।

নেলসন ম্যান্ডেলা
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট
জোহান্সবার্গ, আফ্রিকা

আপোষহীন বন্ধু

কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভেতরে সবার সমান রাঙা। আক্ষরিক অর্থেই এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন আপনি। সাতাশ বছর জেলে থেকে আপনি প্রমাণ করেছেন, সব মানুষের রক্তের রঙ লাল এবং কোনো অন্যায় দেখলে, কোনো অসামঞ্জস্যতা দেখলে সেই রক্ত গরম হয়ে যায়, উথলে ওঠে, ফেটে বের হতে চায় শরীর থেকে।

কালো মানুষের দেশ আফ্রিকা। শোষণ, বঞ্চনা, অবহেলা আর ঘৃণা নিয়ে পথ চলে প্রতিটা শিশু এবং এভাবেই তারা বড় হয়। যে কালোরা একদিন চরম অবহেলিতভাবে জীবনের বিষাক্ত রূপ দেখেছে দিন বদলে গেছে সেই কালোদের। এখন আর তাদের দিকে কেউ ভ্রুকুটি করে তাকায় না, বরং সমীহ করে। এখন সমীহ করে বিশ্বের সর্বকালের সবশ্রেষ্ট মুষ্ঠিযোদ্ধা মোহাম্মাদ আলীকে, বিশ্বের সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ট জনপ্রিয় গায়ক মাইকেল জ্যাকসনকে, বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় পেলেকে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় ব্রায়ান লারাকে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় সেরেনা উইলিয়ামকে, বাস্কেটবল খেলোয়াড় মাইকেল জর্দানকে, অ্যাথলেট কার্ল লুইসকে, অন্যতম শ্রেষ্ট কৌতুক অভিনেতা বিল কসসিকে, অন্যতম অসাধারণ অভিনেতা মরগ্যান ফ্রিম্যানকে ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মডেল নাউমি ক্যামবেলকে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী মার্টিন লুথার কিংকে এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রদ্ধা জাগানিয়া রাজনীতিবিদ আপনাকেও। কালোরা এখন কোথায় নেই, কোথায় নেই এখন তাদের দাপট, কোন সাফল্যে পৌঁছায়নি তারা এখনো?

কিন্তু কালোরা কি এখন পরিপূর্ণ স্বাধীন? আপনার কি মনে হয় স্বাধীন? নাইজেরিয়া, আফ্রিকা, গিনি, আইভরি কোস্ট প্রভৃতি দেশের কর্তৃত্ব এখন কাদের হাতে, কারা ওসব দেশের সম্পদ ভোগ করছে, কারা ওসব

দেশের ঐতিহ্যকে পায়ে পিষছে?

বর্ণবাদের শিকার হয় এখনো অনেক কালো মানুষ। অনেক সভ্যদেশের অনেক আয়গায় এখনো কালো মানুষদের প্রবেশ নিষেধ, এখনো কালোদের দাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কিছুটা শ্বেতাঙ্গ হয়েও আমাদের এই এশিয়ানদের কৃষ্ণাঙ্গদের কাতারেই ফেলা হয়, তাই আমরা জানি অবহেলা কীভাবে করা হয়, কীভাবে তাদের ঠকানো হয় কালো বলে।

হে মানবতাবাদী, বলতে পারেন আপনি—আর কত বছর পর আমরা কালো-সাদার বিভেদ ভুলে যাব, আর কত দাসত্ব করার পর কালোরা তাদের মানুষ স্বীকৃতি পাবে, আর কত ধ্বংসের পর পৃথিবীটা সত্যিকারের সভ্য হবে?

খুব ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন আপনাকে। কোন সময়টা ভালো কেটেছে আপনার—সাতাশ বছর কারাগারের বন্দি জীবন, না মানবিক বিপর্যে ঘেরা এই মুক্ত পৃথিবীর মুক্ত জীবন?

বিয়ের দু দিন আগে বাসা থেকে পালিয়ে আসে বিন্তী। না, বিয়ে বিদ্বেষী সে নয়, বিয়ে সে করবে না সেটাও নয়, পালিয়ে এসেছিল অন্য একটা কারণে, অন্যরকম একটা কারণে।

বিন্তীর বাবা মিনহাজ সাহেব মারা যান হঠাৎ করেই, বিন্তীর বয়স তখন সাড়ে তের। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে বেশ কিছু সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন তিনি। বিন্তীর মা চরম বুদ্ধিমতী, সেই সম্পদ ব্যবহার করে মাত্র আট বছরে তিনি এখন কোটিপতি। একদা সবসময় রান্নাঘরে কাটানো মহিলাটির সময় কাটে এখন সেন্ট্রাল এসির বোর্ড রুমে—মিটিং করেন, পরিকল্পনা করেন, ব্যবসা বাড়ান, বড় বড় হোটেলে গিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে। রিকশায় চড়ে জীবন শুরু করা এই তিনি এখন লেক্সাসে করে ঘুরে বেড়ান দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা। মা সকালে বাসা থেকে বের হয়ে যেতেন, ফিরতেন সেই মাঝ রাতে। মার চোখে-মুখে থাকত ক্লান্তি, শরীরে থাকত অবসাদ। কোনো কোনো রাতে বিন্তী অবাক হয়ে বলত, 'এত রাত করে তুমি কী করো, মা?'

মা হাসতেন, কিছু বলতেন না।

আবার জিজ্ঞেস করত বিন্তী, 'বলো না, মা।'

হেসে হেসেই মা বলতেন, 'অনেক কাজ।'

'অনেক কাজ কী কাজ?'

'সেটা তো তুমি বুঝবে না।' এটুকু বলেই মা তার ঘরে চলে যেতেন। বিন্তী খুব ভালো করে খেয়াল করত তখন তার মাকে–মার দৃপ্ত হাঁটা, আত্মবিশ্বাসী আচরণ, সাহসী পদক্ষেপ; কিন্তু এ সবের মাঝেও কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি লুকিয়ে আছে।

ক্লাস এইটে বৃত্তি পাওয়ার পর মা প্রথম তাকে একটা ডায়েরি গিফট করেছিলেন। অদ্ভুত সুন্দর ছিল ডায়েরিটা। প্রথম প্রথম কোনো কিছু লিখতে ইচ্ছে করত না সেটাতে। একদিন বেশ রাতে মা বাসায় ফিরতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়, একটু পর কান্নাও আসে তার। প্রচণ্ড কথা বলতে ইচ্ছে করে কারো সাথে। কিন্তু এত রাত করে কার সঙ্গে কথা বলবে সে? একটু পর কিছু একটা লিখতেও ইচ্ছে করে তার। হঠাৎ ডায়েরিটার কথা মনে পড়ে, কাঠের আলমারি থেকে সেটা বের করে লিখতে থাকে সে।

> সম্পূর্ণ অন্যরকম লেগেছে আজ মাকে—কিছুটা উদাসীন, অন্যমনস্ক এবং অসচেতন। প্রতি রাতে মা এসে প্রথমেই আমাকে খুব আগ্রহ নিয়ে জড়িয়ে ধরে, আজও ধরেছিল। কিন্তু আজকে যেন কেমনভাবে জড়িয়ে ধরল, আন্তরিক মনে হলো না মার হাতের ছোঁয়া। কথাও বলল না তেমন আজ। কী একটা বলতে নিয়ে থেমে যায়, কিন্তু একটা গন্ধ পাই আমি সঙ্গে সঙ্গে, কিছুটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতো। এটা কীসের গন্ধ? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে—মাকে আজ এমন লাগছে কেন, মা আজ টলেটলে হাঁটছে কেন, মায়ের মুখে ওটা কীসের গন্ধ? কাকে যে জিজ্ঞেস করব!

রাতে ভালো ঘুম হয়নি বিন্তীর। শুধু ছটফট করেছে, দু'বার উঠে পানি খেয়েছে, এমনি এমনি মেঝেতে হাঁটাহাঁটি করেছে মেঝেতে, জানালা খুলে আকাশ দেখেছে উদাস হয়ে।

সকালে কলেজে গিয়ে পাভেলের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় বিন্তীর। লাইব্রেরি রুমের পাশে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'একটা কথা বলতো আমাকে?' বিন্তী চারপাশে সতর্ক চাহনি দিয়ে বলে, 'কী খেলে মানুষের মুখ দিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতো গন্ধ বের হয়?'

পাভেল কিছুটা সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে, 'আগে বল কার মুখ দিয়ে ওরকম গন্ধ বের হয়েছে?'

'সেটা বলা যাবে না।'

'তোর পরিচিত কেউ?'

'সেটাও বলা যাবে না।'

পাভেল বিন্তীর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বলল, 'আজ আমি পান খাব, ঠোঁট লাল করে সবাইকে দেখাব। আমার টুকটুকে জিভ দেখে কুকুর ভাববে কেউ; ভাবুক। আমি তো কুকুরই। কুকুরের মতো ছোঁক ছোঁক করে আকণ্ঠ তরল গিলি আমি, আমার পাকস্থলী বেয়ে সেই তরলের সুবাস বের হয়। আমার ছয় বছরের মেয়ে বলে, তুমি কি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়েছ বাবা? আমি প্রতিদিন আমার মেয়েকে শিখাই—কখনো মিথ্যা বলবে না। কিন্তু সেই আমি মিথ্যা বলি, হ মা, আমি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়েছি, আমার বুকে ব্যথা তো!' পাভেল এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করে বিন্তীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'এবার বুঝেছেন কী খেলে মুখ দিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধের গন্ধ বের হয়?'

'তোরও হার্ড ড্রিংঙ্কসের— ।'

বিন্তীকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দেয় পাভেল, 'না, আমার কোনো হার্ড ডিংঙ্কসের অভ্যাস নেই। আমি তোকে একটা কবিতা শুনিয়েছি। কার কবিতা এটা জানিস?'

'কার কবিতা?'

'আমিও জানি না।' পাভেল হাসতে হাসতে বলল, 'তোকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। কোনো সমস্যা?'

'হ্যাঁ, একটা সমস্যা আছে আমার।'

'বলা যাবে আমাকে?'

'আপাতত না। তবে তোকে বলব, আজ না, কাল অথবা পরশু।'

বাসায় ফিরে বিন্তী অপেক্ষা করে কখন রাত হবে, কখন মা বাসায় ফিরবে। অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়, মা বাসায় ফেরে, ঘরে ঢুকে জড়িয়ে ধরে তাকে, ছোট্ট করে চুমুও খায়। মার মুখে আজকেও গন্ধ, হোমিওপ্যাথি ওষুধের গন্ধ, মা আজকেও টলেটলে হেঁটে যায় তার রুমে।

রাত হলে বিন্তীর এখন একটাই কাজ—মার জন্য অপেক্ষা করা। অপেক্ষা করতে করতে কোনো কোনো দিন ঘুমিয়ে যায় সে, একটু পর আবার চমকে জেগে ওঠে।

মার মুখে এখন প্রতিদিন হোমিওপ্যাথি ওষুধের গন্ধ পাওয়া যায়, মা এখন নিয়মিত টলেটলে হাঁটে। ইদানীং মা মাঝে মাঝেই তাকে জড়িয়ে ধরতে ভুলে যায়, কোনো কোনো সময় ঘরে গিয়ে আবার ফিরে এসে জড়িয়ে ধরে, কোনো কোনো সময় ধরেও না।

সারাদিন একদিন মনটা খারাপ ছিল বিন্তীর। রাতে মনটা আরো বেশি খারাপ হয়ে যায়। রাত দুটো, বাসার সামনে গাড়ির শব্দ হতেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় সে। গাড়ি থেকে প্রথমে একটা লোক নামে। বিন্তী ভালো করে তাকায়, চিনতে পারে না তাকে। একটু পর মা নামে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মার কোমর জড়িয়ে ধরে মুখটা এগিয়ে দেয় মার মুখের দিকে। তারপরেরটুকু দেখে না ও, দেখতে ও চায় না। সারা এলাকায় সুনশান নীরবতা, কিন্তু বিন্তী টের পায় তার বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে, নিউরনের লাফালাফি শুরু হয়ে গেছে তার মাথার ভেতর। সেই রাতেও ঘুমাতে পারে না ও। সারা মেঝে পায়চারি করেছে আর জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকেছে। বাইরে অন্ধকার, তবুও তাকিয়ে ছিল, যদি কোথাও একটা আলো দেখা যায়, যদি কোথাও একটু জোনাকি দেখা যায়। না, বাইরের অন্ধকারের মতো বিন্তী নিজেও অন্ধকারে ডুবে যায়, কোথাও আলো নেই, একটুও নেই।

সন্ধ্যার দিকে একদিন পড়ছিল বিন্তী। কয়েকদিন ধরে মোটেই ভালো পড়া হচ্ছিল না। সামনে পরীক্ষা, সম্ভবত পরীক্ষাও ভালো দেওয়া হবে না। ঝিম মেরে বসে ছিল সে টেবিলে বই মেলে। হঠাৎ বাসার সামনে গাড়ির শব্দ। বারান্দায় যেতে নিতেই আবার বসে পড়ে চেয়ারে। না, মা এত তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার কথা না। কিন্তু মা ফিরেছেন, ড্রইংরুমের দরজা খোলার শব্দে বিন্তী টের পেল—মা, একা না, আরো একজন এসেছেন।

বিন্তীর ঘরে ঢুকল মা। মার মুখ হাসি হাসি। খুব আন্তরিকতা নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তিনি তাকে, 'কেমন আছিস, মা?'।

খুব করুণ চোখে মার দিকে তাকাল বিন্তী, কিছু বলল না। মা মুখের হাসিটা আরো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?'

'তোমাকে খুব অচেনা লাগছে।'

'কেন?' মার সারা শরীরে আনন্দ, মার চোখে-মুখে আনন্দ, মার প্রতিটি অভিব্যক্তি, আচরণে আনন্দ।

কথাটার উত্তর দিল না বিন্তী। মাথাটা নিচু করে বলল, 'কত দিন পর তুমি আমার ঘরে এলে, জড়িয়ে ধরলে এভাবে, আমি কেমন আছি তা জিজ্ঞেস করলে?'

'অনেক কাজ বেড়েছে না আমার!'

'কত কাজ বেড়েছে? মিশেল ওবামার চেয়ে বেশি কাজ তোমার?

প্রায়ই তো টিভি-পেপারে দেখি তার দু মেয়েকে নিয়ে তিনি এখানে ওখানে যাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন। অথচ তুমি আজকাল গভীর রাতে বাসায় ফেরো, সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হয়ে ফেরো। তোমার মুখে এখন অ্যালকোহলের গন্ধ থাকে, শরীরে থাকে ক্লান্তি, চোখ থাকে ধূসর।'

মা আবার জড়িয়ে ধরেন বিন্তীকে, 'সব কিছু দেখতে নেই, মা।'

'কেন দেখতে নেই!' কিছুটা রূঢ় স্বরে বলে বিন্তী।

'সব কিছু দেখলে কষ্ট হয়।'

'সব কিছু দেখলে কষ্ট হয় না, মা; সব পাপ দেখলে কষ্ট হয়।'

শব্দ করে হেসে ওঠেন মা, 'তুই এভাবে বলছিস! আমি এসব কার জন্য করছি?'

'তোমার জন্য, স্রেফ তোমার জন্য। মানুষ যত কিছুই করুক প্রথমে তার নিজের জন্য করে, তারপর আসে অন্যের কথা।'

'তোর কি মন খারাপ?' মা আলতো করে হাত রাখে বিন্তীর কাঁধে।

'কী জানি!'

'বুঝতে পেরেছি তোর মন খারাপ। চল, আজ রাতে বাইরে খাব। আজ সব তোর পছন্দের খাবার খাব।' মা ওর হাত ধরে টেনে তুলে বলেন, 'চল, একজনের সঙ্গে পরিচয় করে দিই তোর।'

মার কাছ থেকে আলতো করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিন্তী বলল, 'কারো সঙ্গে পরিচিত হতে ভালো লাগছে না এখন।'

'লোকটাকে আগে দেখ, ভালো লাগবে তোর।'

চোখ তুলে বিন্তী মার দিকে তাকায়। চোখ দুটো একটু কঠিন করে বলে, 'যার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে, সে আমার কে হয়?'

'তোর আবার কী হবে—।' মা কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে বলে, 'আঙ্কেল হয় তোর।'

'কেমন আঙ্কেল?'

'কেমন আঙ্কেল আবার, আমার সাথে উনি ব্যবসা করেন।'

'তোমার সাথে ব্যবসা করেন আর তাই তিনি আমার আঙ্কেল হয়ে গেলেন!' বিন্তী ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'না মা, আমি ওনার সাথে দেখা করব না, কথা বলা তো দূরের কথা।'

'তুই এমন করছিস কেন, বল তো? আজ ওনার সাথে কত বড় একটা ব্যবসার চুক্তি হলো জানিস? আগামীতে আরো বড় বড় ব্যবসার চুক্তি হবে।

ওনার সাথে সম্পর্ক রাখা খারাপ কিছু না।'

'তোমার সাথে ওনার সম্পর্ক নেই।'

'থাকবে না কেন, না হলে ব্যবসা করছি কীভাবে?'

'মায়ের সঙ্গে আছে, এখন মেয়ের সঙ্গেও সম্পর্ক লাগবে!'

'তুই এসব কী বলছিস?'

'আমি কী বলছি সেটা তুমি বুঝেছ, মা। তোমাদের এসব ব্যবসা-ট্যাবসা আমি বুঝি না। আমি তাই কোনো কিছু পান করা বুঝি না, কোমরে হাত রেখে অন্য কোনো পুরুষের ঠোঁটে ঠোঁট রাখা বুঝি না, আরো গভীর কিছু করা বুঝি না, সম্পর্ক রাখা কিংবা সম্পর্ক উন্নয়নের কথাও বুঝি না। আমি বুঝি অন্য কিছু, যা তুমি বোঝ না, সেটা বোঝার বোধ তোমার মরে গেছে, সেই কবেই মরে গেছে।' বিন্তী একটু থেমে বলে, 'টাকা আর ক্ষমতার নেশা মানুষের অনেক বোধ নষ্ট করে ফেলে, মা।'

সীতাকুণ্ড পাহাড়ের কাছে এসে পাভেল বলল, 'এ পাহাড়ের ওপর একটা মন্দির আছে না?'

সুশান্ত উপরের দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ, একটা মন্দির আছে।'

যুথী কিছুটা লাফিয়ে উঠে বলল, 'আমি ওই মন্দির দেখব।'

'মন্দির দেখতে হলে পাহাড়ে উঠতে হবে।'

'উঠব। কোনো সমস্যা আছে নাকি?'

'সমস্যা তো একটা আছেই।'

'কী সমস্যা?'

সুশান্ত বলার আগেই সৌম্য বলল, 'অনেক উঁচু পাহাড়।'

'উঁচু পাহাড় হয়েছে তো কী হয়েছে, অনেকে উঠছে না?' যুথী উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অনেকে যখন উঠতে পারে, তাহলে আমরাও উঠতে পারব।

'সমস্যাটা তো সেখানে না। দেখা গেল বেশ কিছুদূর ওঠার পর তুই আর উঠতেও পারছিস না, নামতেও পারছিস না। তখন তো তোকে কোলে করে নামাতে হবে। এই শাস্তিটা কে পেতে নেবে?'

'শাস্তি মানে!' যুথী চোখ বড় বড় করে বলে।

'শাস্তি মানে শাস্তি। এই পাহাড় বেয়ে একাই ওঠা যায় না, নামাও কঠিন, সেখানে আরেকজনকে কোলে নেওয়া শাস্তির শামিল না?' সৌম্য

হাসতে হাসতে বলে, 'আমি ভাই এর মধ্যে নাই কিন্তু!'

'তুই কি ভেবেছিস ওরকম হলে আমি তোর কোলে উঠব? তার চেয়ে পাহাড় থেকে লাফ দেব।'

'পা ভেঙে যাবে তো তোর?'

'পা ভাঙুক আর মাথা ফাটুক, তবুও তোর কোলে উঠব না। প্রয়োজন হলে সিঁড়িতে বসেই সারাজীবন কাটিয়ে দেব, তবুও না।'

'ঠিক আছে দেখা যাবে। আমার পা ধরে কাঁদলেও কিন্তু আমি তোর হাতটা পর্যন্ত ধরব না। এই পাহাড়ের কসম, পাহাড়ের ওপর ওই মন্দিরের কসম।' সৌম্য মুচকি হেসে যুথীর দিকে তাকায়। যুথী মুখটা ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায়।

সীতাকুণ্ডের পাহাড়টার নাম চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথের বুক চিরে একটা সিঁড়ি চলে গেছে ওপরে, খুবই চিকন সিঁড়ি, আকাবাঁকা সিঁড়ি। কোনো কোনো জায়গায় সিঁড়িটা এমন বাঁকা ভীষণ ভয় করে, এই বুঝি পা পিছলে পড়বে, গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যাবে নিচে।

যুথীই প্রথম পাহাড়ের সিঁড়িতে পা রাখল। তরতর করে কিছুদূর উঠেও গেল। তারপর হঠাৎ থেমে বলল, 'আর পারছি না, গলা দিয়ে জিভ বের হয়ে আসতে চাচ্ছে।'

'তাহলে তো মুশকিল হয়ে যাবে রে।' যুথীর দিকে তাকিয়ে খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে সৌম্য।

'কীসের অসুবিধা?' যুথী চমকে উঠে বলল। হাঁপাচ্ছে ও।

'জিভ যদি গলা থেকে বেরই হয়ে যায়, তাহলে তো খাবার খাওয়ার কোনো স্বাদ পাবি না। তোর তো তখন বিয়েও হবে না।'

'বিয়ে হবে না কেন?'

'তুই কি ভাবিস দেশে এতই মেয়ের অভাব পড়েছে যে, একটা জিভ ছাড়া মেয়েকে বিয়ে করতে হবে?'

যুথী কী একটা বলতে চায়, কিন্তু তার আগেই বৃদ্ধা একটা মহিলা ধমকের স্বরে বলে, 'সিঁড়িতে সবাই জটলা পেকে আছে কেন, আমরা উঠব কীভাবে? পুজার সময় শেষ হয়ে গেল, ভগবান ভগবান।'

সরে দাঁড়াল সবাই। বৃদ্ধাটি খুব দ্রুত গতিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন, তাকে দেখে মনে হচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছেন তিনি। পুজোর সময় শেষ হয়ে গেলে বাঁচবেন না তিনি।

পাভেল বলল, 'দেখেছিস?'

সৌম্য বলল, 'দেখলাম।'

'তর তর করে উপরে উঠে গেলেন মহিলাটি। অথচ বয়স হয়েছে অনেক, কী খটখটে শরীর, এক টুকরো মাংসও নেই।'

সুশান্ত খুব শান্ত স্বরে বলল, 'কিন্তু বিশ্বাস আছে। ভগবানকে পাওয়ার বিশ্বাসই ওই মহিলাকে শক্তি দিয়েছে।'

'বিশ্বাস থাকলে তাহলে অনেক কিছু করা যায়!' বিন্তী বলল।

'অবশ্যই।'

'আমাদের এই পাঁচজনেরও তো বিশ্বাস আছে, আছে না?' বিন্তী সবার দিকে একপলক তাকায়।

'তোর কি কোনো অবিশ্বাস হচ্ছে?'

'মোটেই না। আমরা যে বিশ্বাস নিয়ে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি, আমরা তাতে সফল হবোই।' বেশ উৎসাহ নিয়ে বলল বিন্তী।

যুথী হাঁপাতে হাঁপাতেই আরো একটু উপরে উঠেই বমি করে করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সুশান্ত ওর হাত চেপে ধরে বলল, 'উঠতে পারছিস না, কষ্ট হচ্ছে তোর, তোকে আর উঠতে বলেছে কে?'

কোনো কথা বলে না যুথী। আস্তে করে শরীরটা এলিয়ে দিল সুশান্তের ওপর। সুশান্ত ওকে পাঁজাকোলা করে ধরে বেশ দ্রুত গতিতে নিচের দিকে নামতে থাকে। উপরে ওঠা কঠিন, নিচে নামা সহজ—সব ক্ষেত্রেই সত্য এ কথাটা মতো খুব দ্রুতগতিতে নিচে নেমে এল সুশান্ত। সবুজ ঘন ঘন ঘাসের ওপর ওকে শুইয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'দ্রুত এক বোতল পানি কিনে আনতো, খুব দ্রুত আন।'

পাভেল আর সৌম্য দৌড়াতে লাগল একসঙ্গে। কাছেই কিছু দোকান ছিল, পানি কিনে এনে ফিরে এল আবার একসঙ্গেই। সুশান্ত বোতলটা হাতে নিয়ে খুলে যুথীর মুখে ঢালতে লাগল অল্প অল্প। দু ঢোক পানি খেয়েই উঠে বসল যুথী। লাজমিশ্রিত হাসিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখ।'

সামনের দিকে তাকাল সবাই। অল্প বয়সী একটা দম্পতি খুব আনন্দ নিয়ে এগিয়ে আসছে। সম্ভবত অল্পদিন ধরে বিয়ে হয়েছে তাদের। পাহাড়ের ওপরের মন্দিরে যাবে ওরা পুজো দিতে। লাল টকটকে সিঁদুরে অদ্ভুত লাগছে মেয়েটাকে, চকচকে লাগছে ছেলেটাকেও।

নরম সবুজ ঘাস। যুথীকে ঘিরে বসে পড়ল ওরা। বিন্তীর একটা হাত

নিজের হাতে নিয়ে যুথী বলল, 'তোর তো এতদিন বিয়ে হয়ে যেত, কিন্তু বিয়ের দু দিন আগেই বাসা থেকে পালিয়ে এসেছিলি। কোনো কিছু বলিসনি আমাদের। আজ বলবি?'

'বলতে ইচ্ছে করে না।'

'তাহলে থাক।'

বিন্তী মাথাটা নিচু করে বলে, 'কিন্তু একদিন তো তোদেরকে বলতেই হবে।' বিন্তী কী যেন ভাবতে থাকে। শেষে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'মা তার ব্যবসার স্বার্থে একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে আমার। আমি কোনো কথা বলিনি। মা তো মেয়ের মঙ্গলই চায়।

বিয়ের ঠিক তিন দিন আগে জানতে পারি ছেলের বাবা বিরাট ব্যবসায়ী ক্ষমতাবানও। কিন্তু একাত্তরে তিনি খারাপ ভূমিকা নিয়েছিলেন।'

'রাজাকার ছিলেন তিনি?' সৌম্য জিজ্ঞেস করে।

'রাজাকার-দেশদ্রোহী বুঝি না আমি, আমি বুঝি—আমার বাবা দেশের পক্ষে একাত্তরে যুদ্ধ করেছিলেন, তার মেয়ে হয়ে দেশের বিরুদ্ধে কাজ করা একটা লোকের ছেলেকে কীকরে বিয়ে করি আমি! এবার তোরা বল, আমি ঠিক করেছি, না ভুল করেছি?'

'শুয়োরের বাচ্চা।' পাভেল কাকে উদ্দেশ্য করে গালি দেয় বোঝা যায় না। থু করে একদলা থুতু ফেলে বলল, 'তোর উচিত ছিল ছেলেটাকে বিয়ে করা এবং বাসর রাতে মাছ কাটা দা দিয়ে চুপচাপ তার গলা কেটে ফেলা। রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার!

মাহাথীর মোহাম্মদ
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট
কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া

সজ্জন বন্ধু

মাত্র পঁচিশ বছরে একটা দেশকে বিশ্বের দরবারে শুধু অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালীই করেননি আপনি, করেছেন মর্যাদাবানও। বিশ্ব এখন এক নামে চেনে মালয়েশিয়াকে। তৃতীয় বিশ্বের মহাদেশ হিসেবে পরিচিত এশিয়ার এই দেশটিকে দেখে মনে হয় না এটা এশিয়ার কোনো দেশ। নোংরা, দুর্গন্ধময়, মানুষের গিজগিজ করা অতি পরিচিত দৃশ্য এখানে নেই, নেই তেমন কোনো দুর্নীতি, রাস্তায় কোনো জ্যাম নেই, রাজনীতিবিদদের বিরক্তিকর গলাবাজি নেই। বেকারদের চাকুরির জন্য হাহাকার নেই, নদী দখল-ভূমি দখল নেই, বর্জ্য ফেলে পরিবেশ নষ্ট করা সেই, রাহাজানি নেই, ছিনতাই নেই, টেন্ডারবাজি নেই, ছাত্ররাজনীতির মতো চরিত্র নষ্ট করার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেই। নেই মন্ত্রী-মিনিস্টারের টাকা ইনকামের নির্লজ্জ প্রজেক্ট, একটা বাড়ি থাকার পরও অনিয়ম করে আরেকটা প্লট বাগিয়ে নেওয়ার মিথ্যা-ছলচাতুরি, নেই ক্ষমতাবানদের সন্তানগুলোর ক্ষমতা প্রদর্শন, যা ইচ্ছে তাই করার দাপট। নেই নিজ দায়িত্ব পালন না করে প্রাইভেট ক্লিনিকে ডাক্তারদের লোভাতুর সময় কাটানো, প্রকৌশলীদের সম্মিলিতভাবে পাওয়া ঘুষের টাকার ভাগ-বন্টন, নেই কাস্টম অফিসারদের ফুলে ফেঁপে সম্পদ বাগানোর ঘৃণ্য অপক্রিয়া, নেই নিরাপত্তাকর্মীদের সাধারণ জনগণকে নিরাপত্তাহীন করার প্রতিনিয়ত কৌশল।

তথাকথিত রাজনীতিবিদের মতো স্বজনপ্রীতি করে যেতে পারতেন আপনি; ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার সময় ছেলে, মেয়ে কিংবা কোনো নিকট আত্মীয়কে ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতায় বসাতে পারতেন আপনি, কিংবা পার্টির চেয়ারপার্সন অথবা সভাপতি-সভানেত্রীর পদটাও দিয়ে যেতে পারতেন, যেমনটা করে এশিয়া তথা বিশ্বের অনেক দেশের

ক্ষমতাবানরা। আরো পারতেন টাকার পাহাড় গড়ে তুলে সুইস ব্যাংকে সেগুলো জমিয়ে রাখতে, সম্পদ পাচার করতে কিংবা নিজের চৌদ্দ গুষ্টির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য দেশকে যেমন ইচ্ছে তেমন ব্যবহার করতে। স্বেচ্ছায় ক্ষমতা আজকাল কে ক্ষমতা ছাড়ে? ক্ষমতা আকড়ে ধরার জন্য কিংবা ক্ষমতা পাওয়ার জন্য মানুষের আজ কত কৌশল, কত মিথ্যা ফুলঝুরি, দেশপ্রেমিক সাজার নিকৃষ্ট প্রহসন। ক্ষমতার জন্য মানুষ মানুষকে খুন করে, বিপদে ফেলে, অন্য দেশের কাছে নিজ দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, বিদেশী প্রভুদের লেজুড়বৃত্তি করে, দেশের জনগণের কথা চিন্তা না করে কেবল নিজের কথা ভাবে।

অন্যায় আপনি পছন্দ করতেন না, ক্ষমতায় থাকার সময় আপনার কাছের মানুষকে আপনি ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন জঘন্যতম একটা অন্যায় করার জন্য। এ সৎ সাহস, এ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কতজনের আছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অধিকাংশ ক্ষমতাবান যেমন নিজে অন্যায় করে, অন্যায় করতে দেয় কাছের জনদের। আপনি এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, অন্যরকম, অন্য ধাঁচের।

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান দেশের ক্ষমতাবানের বিরুদ্ধে কে কথা বলতে পারে, কে করতে পারে তার কঠোর সমালোচনা? নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সবাই যখন তাকে তোয়াজ করে চলে, স্তুতি গেয়ে চলে, সেখানে সমালোচনামূখর।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ সবই হয়েছে আপনার সততার জন্য। প্রিয় মানুষ, আপনি কি একটু বলবেন—কীভাবে এতসব মোহের মাঝে নিজেকে নির্লোভী রাখা যায়, নিজেকে রাখা যায় সৎ, মহৎ, উদার। যদি জানতে পারতাম, জীবনটাকে নতুনভাবে সাজাতাম আমরা, নতুন আর একটা জীবনের জন্য স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতাম আজীবন!

নয় বছর পর কয়েকদিন আগে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিল পাভেল, বাবার সঙ্গে। পাভেলের বাবা সিরতাজ আলম অবশ্য নিতে চাননি, কিছুটা জোর করেই গিয়েছিল সে। বাবাও গ্রামে কম যান, বছরে খুব বেশি হলে দু-তিন বার। দু ঈদে দুবার, আর মাঝখানে একবার। তবে চার বছর পর পর বিশেষ একটা বছরে বাবার গ্রামের যাত্রাটা একটু ঘন ঘন হয়। বাবাও খুব আগ্রহ নিয়ে গ্রামে যান, তার ব্যস্ততা তখন শহরকেন্দ্রিকতা থেকে গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে যায়। এমনকি বাবার ভাষাও পরিবর্তন হয়ে যায় তখন। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে তিনি তখন গ্রামের ভাষাতেই কথা বলেন।

গ্রামে যাওয়ার আগের দিন সিরতাজ আলম তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'কেন যেন এবার গ্রামে যেতে ভালো লাগছে না।'

কাপে চা ঢালছিলেন সঞ্চিতা আলম। ফ্লাস্কটা একটু উঁচু করে ধরেন তিনি। চা ঢালা বন্ধ করে তিনি বলেন, 'কেন?'

'একটা ভয় পাচ্ছি আমি।'

'কীসের ভয়?'

'আপাতত সেটা তোমাকে বলতে পারব না আমি।' চেয়ারে একটু হেলান দিয়ে সিরতাজ আলম বলেন, 'ভয়টা আমি অনেকদিন ধরেই পাচ্ছি।'

'তাহলে এবার গ্রামে যাওয়ার দরকার নেই।'

'কিন্তু যেতে তো হবে। সামনে নির্বাচন না!'

'এবার নির্বাচন না করলে কী হয়?'

'কিছুই হয় না।'

'তাহলে?'

সঞ্চিতা আলমের হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে সিরতাজ আলম সোজা হয়ে বসেন। আয়েশ করে একটা চুমক দিয়ে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'নির্বাচন করা হচ্ছে অনেকটা পতিতালয়ে যাওয়ার মতো, একবার অভ্যাস হয়ে গেলে সেটা থেকে আর বিরত রাখা যায় না নিজেকে।'

স্বামীর পাশের চেয়ারে বসেন সঞ্চিতা আলম। আলতো তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, 'তুমি কী ধরনের ভয় পাচ্ছো সেটা কি বলা যাবে?'

ঝিম মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকেন সিরতাজ আলম। চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকাচ্ছেন ধীরে ধীরে, কিন্তু কোনো কথা বলছেন না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বারান্দার সামনের দিকে। সেই তাকানোতে কোনো কিছু দেখছেন না, ভাবছেন।

'এবার তাহলে একা যাওয়ার দরকার নেই।'

'একা তো যাচ্ছি না, পাভেল যাচ্ছে।'

'এখানে তোমার অনেক ধরনের মানুষ আছে না, ওদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে নিয়ে যাও।'

'শহর থেকে গ্রামে লোক নিয়ে গেলে গ্রামের লোকজন মাইন্ড করে, মন খারাপ করে। মুখ্য-সুখ্য মানুষ তো! কিছু বলাও যায় না, সওয়াও যায় না।'

'এক কাজ করো, এবার তুমি আমাকে নিয়ে যাও।'

সিরতাজ আলম হেসে ফেলেন। স্ত্রীর একটা হাত চেপে ধরে বলেন, 'তুমি গিয়ে কী করবে?'

'কিছু করতে না পারি, তোমার সঙ্গে তো থাকতে পারব।'

মোবাইলটা বেজে ওঠে সিরতাজ আলমের। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সেটা বের করে স্ক্রিনের দিকে তাকান। তারপর দ্রুত চেয়ার থেকে উঠে ঘরের ভেতর চলে যান তিনি।

চারদিন পর সিরতাজ আলম একাই গ্রামে গেলেন, সঙ্গে পাভেল। গ্রামে এসেই দাদুর বাড়ির পুকুরটা সবচেয়ে প্রিয় হয়ে ওঠে ওর। সারাক্ষণ সাঁতার কাটে আর মাছ ধরে বড়শি দিয়ে। কলেজ পড়ুয়া একটা ছেলের পাগলামি দেখে সবাই হাসে।

দাদুর বাড়ির বাইরের উঠোনটাতে চেয়ার সাজানো হচ্ছে। বিকেলে সেখানে মিটিং হবে। গ্রামের সব লোকজন আসবেন। ভালো কিছু রান্নাও হচ্ছে তাদের জন্য।

দাদুর গ্রাম সম্পর্কীয় একটা ভাই এসে দাদুকে বললেন, 'আপনে মিটিংটা বন্ধ করেন।'

কিছুটা চমকে উঠে দাদু বললেন, 'কেন?'

দাদুর ভাই বলেন, 'কারণ আছে, কারণটা এখন কওয়া যাইব না।'

সিরতাজ আলমের কানে কথাটা যেতেই চিৎকার করে উঠে তিনি বলেন, 'আমি মিটিং করব, যার সাহস আছে সে ঠেকাক।'

বিকেলে মিটিং হলো, খাওয়া-দাওয়াও হলো, কিন্তু যার আশঙ্কা করা হয়েছিল তার কিছুই হলো না। খুব শান্তভাবে সব কিছু শেষ হলো।

রাত দশটার দিকে সিরতাজ আলম পাভেলকে বললেন, 'কাল সকালে তো চলে যাব, অনেকদিন গ্রামে আসিস না, কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ঘুরিয়ে আনি তোকে।'

পাভেলের দাদুর বাড়ির সামনে মাটির একটা রাস্তা আছে। গ্রামের কয়েক মাইল ভেতরে চলে গেছে সেই রাস্তাটা। সিরতাজ আলম সেই রাস্তায় পা দিয়ে বললেন, 'আজ অনেক দূর যাব, হাঁটতে পারবি তো।'

'তুমি আমাকে কী মনে করো বাবা?

সিরতাজ আলম বললেন, 'তাহলে চল।'

আধা মাইলের মতো ভেতরে এসেছেন তিনি। এই জায়গাটা ফাঁকা, চারপাশে ধানক্ষেত। চাঁদ উঠেছে আকাশে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু। হঠাৎ সাত-আটজন মানুষ কোথা থেকে এসে সিরতাজ আলমের সামনে এসে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সবার মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা।

কিছুটা রূঢ় গলায় তিনি বললেন, 'কে?'

কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা লোকগুলো মধ্যে যিনি লম্বা তিনি বললেন, 'সিরতাজ ভাই, আপনি আমাদের চিনবেন না।'

'কী চান আপনারা?'

'চাওয়ার কিছু নেই, সামান্য বলার আছে।'

'বলবেন ভালো, কিন্তু এরকম মুখ ঢেকে কেন?'

'কারা মুখ ঢেকে আসে তা আপনি ভালো করেই জানেন।'

'মানে?'

'মানে কিছু না।' লম্বা লোকটা পাভেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি একটু ফাঁকে যাও, তোমার বাবার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

সিরতাজ আলম চিৎকার করার মতো করে বললেন, 'না, ও কোথাও যাবে না, আমার সঙ্গেই থাকবে।'

'আমরা যে কথাগুলো বলব তা আপনার এই ছেলের সামনে বললে মান-সম্মান আপনারই যাবে।'

'তবুও ও আমার সঙ্গে থাকবে।'

'ঠিক আছে থাকুক।' লম্বা লোকটা একটু থেমে বলেন, 'এবার নির্বাচনে আপনি দাঁড়াতে পারবেন না।'

'কেন?'

'আপনাকে গত দুবার নির্বাচিত করেছি আমরা। কিন্তু আপনি এ এলাকার কোনো কাজ করেন নাই।'

'কী কাজ করি নাই।' উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলেন সিরতাজ আলম।

'বললাম তো কোনো কাজই করেননি। আমাদের এখানে একটা ব্রিজ হওয়ার কথা ছিল, ব্রিজের শুধু চারটি পিলার বানানো হয়েছে, বাকী সব টাকা আপনি মেরে দিয়েছেন। স্কুল কমিটির নামে তিন লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেটা আপনি নিজে তুলেছেন, কিন্তু স্কুলে কোনো পয়সাও দেননি আপনি। এই রাস্তাটা পাকা করার কথা ছিল, টেন্ডার হয়েছিল, কেউ টেন্ডার জমা দেয়নি, অন্যের নামে কাজ পেয়েছিলেন আপনি, রাস্তা আগের মতোই রয়ে গেছে। গত শীতে গরিবদের জন্য একশটা কম্বল এসেছিল, আপনি তার মধ্যে দশটা দান করেছিলেন, তাও নিজেদের লোকদের মাঝে, বাকী কম্বলের কোনো হদিস নেই।' লম্বা লোকটা দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'সারা বছর কোনো খবর নেই, নির্বাচন এলেই কেবল আপনি গ্রামে

আসেন, শহরে আপনার বাসায় গিয়েও আপনার দেখা পাওয়া যায় না। প্রতিবার নির্বাচনের আগে আমরা আপনার প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে পাগল হয়ে গেছি। এবার অন্য একজন নির্বাচনে দাঁড়াবে, আপনি না।'

'তোমরা বললেই হলো!'

'হ্যাঁ, আমরা বলেছি বলেই নিবাচনে দাঁড়াতে পারবেন না আপনি।'

'কার কাছ থেকে কত টাকা খেয়েছ তোমরা?'

লম্বা লোকটা শব্দ করে একটু হেসে বললেন, 'আপনার আসল পরিচয়টা দিয়ে ফেললেন আপনি। সবাইকে আপনি আপনার নিজের মতো টাকাখোর ভাবেন। খুবই খারাপ কথা। আপনাকে বাইরে থেকে দেখে যত ভালো মানুষ মনে হয়, আপনি আসলে অনেক খারাপ একজন মানুষ, স্বার্থপর তো বটেই। আপনার সব চিন্তা নিজেকে নিয়ে, আপনার পাশের জনের চিন্তা কখনো করেন না আপনি।'

'এসব আজেবাজে কথা বলার সাহস আপনি কোথায় পেয়েছেন?'

'সাহস পেতে হয় না, সাহস অর্জন করতে হয় সিরতাজ ভাই।'

'সাহস থাকলে মুখের কাপড় খুলে আমার সামনে দাঁড়ান।' সিরতাজ আলম কোমর থেকে তার পিস্তলটা বের করতে করতে বললেন, 'গুলি করে মারব আমি আপনাকে।' কিন্তু পিস্তলটা সম্পূর্ণ বের করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে থাবা মেরে ফেলে দেয় একজন সেটা। সঙ্গে সঙ্গে সিরতাজ আলম দৌড়াতে থাকেন। হকচকিয়ে যায় পাভেল। বাবা তাকে রেখে দৌড়ে পালাচ্ছে, অথচ লোকগুলো বাবাকে কোনোরকম ধাওয়া করেনি।

অনেকদূর চলে যাওয়ার পর পাভেল লোকগুলোর দিকে ভয় ভয় চোখে তাকায়। লোকগুলো ওকে কিছুই বলে না। যেদিক থেকে এসেছিল চলে যায় সেদিকেই।

খুব সময় নিয়ে বাসায় ফেরে পাভেল। দাদুর বাসার সামনে এসে দেখে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার পাশে। কিছুটা অপ্রকৃতিস্থের মতো তিনি এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। ওকে দেখেই কিছুটা দৌড়ে এসে বলেন, 'তুই এসেছিস, তোকে কিছু বলেনি তো ওরা?'

'জি, বলেছে।' বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে পাভেল বলে।

'কী বলেছে?'

'বলেছে—যে বাবা তার ছেলেকে বিপদের মাঝে ফেলে দৌড়ে পালায় সে কখনো বাবা হতে পারে না।'

'এই কথা বলেছে তোকে!'

'আরো অনেক কিছু বলেছে।'

'যাই বলুক, তুই কিছু মনে করিস না। আর—।' সিরতাজ আলম আশপাশে একটু তাকিয়ে বলেন, 'আজ যে ঘটনা ঘটে গেল এটাও কাউকে বলার দরকার নেই। বুঝিসই তো প্রেস্টিজের ব্যাপার।'

পাভেল বাবার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, 'ওরা যা বলল তার সবই মিথ্যা, বাবা?'

'সব মিথ্যা, স-ব।'

'তুমি আরেকটা মিথ্যা কথা বললে, বাবা।' পাভেল বাবার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'তোমার বাবাকে নিয়ে তুমি মাঝে মাঝে গর্বমূলক কথা বলো, তার প্রশংসা করো, তার গুণের কথা বলো। শুনতে আমাদের খুব ভালো লাগে, আনন্দে বুক ভরে ওঠে আমার। কিন্তু তুমি কি বলবে—আমি আমার বাবাকে নিয়ে কোন গর্বমূলক কথাটা বলব, কোন প্রশংসা করব, কোন গুণের কথা বলব তার? আছে কি সেরকম কিছু? আমার চোখের সামনে আজ থেকে ভেসে বেড়াবে ওই একটা দৃশ্যই—আমার বাবা কোনো রকম আমার কথা না ভেবে মানুষের ভয়ে আমাকে ছেড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে!'

রুমে ঢুকে বারান্দায় গিয়ে যুথী দেখে পাভেল কাঁদছে। শব্দ করে কাঁদছে না, কিন্তু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছে। যুথী চিৎকার করে বলে, 'এই তোর কী হয়েছে?'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে পাভেল বলল, 'কিছু না।'

'কিছু না তো কাঁদছিস কেন?'

'এমনি।'

'এমনি কেউ কাঁদে!'

'পাভেলের মতো হতভাগারা কাঁদে।' পাভেল ম্লান হেসে বলে, 'আজ ফাদার্স ডে না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আজও না, আগামীবারও না, কোনোবারই আমি আমার বাবাকে বলতে পারব না—হ্যাপি ফাদার্স ডে, বাবা। আই লাভ ইউ, বাবা।'

ফিদেল ক্যাস্ট্রো
অবসর গ্রহণকারী প্রেসিডেন্ট
হাভানা, কিউবা

প্রিয় লৌহমানব

দুটো কথা আছে আমাদের এই বাংলাদেশে—জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না কিংবা বনে থেকে যুদ্ধ করা যায় না বাঘের সঙ্গে। কথাটা আপনি নির্জলা মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। কয়েক দশক ধরে বিশ্বের ক্ষমতাধর আমেরিকার কোলের মধ্যে বাস করে আপনি তার বিরোধিতা করেছেন, তার সমালোচনা করেছেন, তার নিন্দনীয় কাজে নিন্দা করেছেন প্রকাশ্য। তার জন্য আপনাকে সইতে হয়েছে অনেক যাতনা, লাঞ্ছনা, ভয়-ভীতি, উপেক্ষা, অবরোধ, হুমকি—তবুও আপনি অনড়, লৌহদণ্ডের মতো দণ্ডায়মান।

বয়সকে সবাই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে পারে না, আপনি পেরেছেন। বারবার মৃত্যু এসে থমকে গেছে, ফিরে গেছে আপনার কাছ থেকে, আপনি হাসি মুখে আবার আপনার কাজে ফিরে গিয়ে শক্ত হাতে দেশের হাল ধরেছেন। এই আশি-উর্ধ্ব বয়সে আপনি এখনো নবীনের মতো দীপ্ত, যুবকের মতো নির্ভার।

খুব ভাগ্যবান আপনি। বিশ্বের সবচেয়ে মোহ-জাগানিয়া, যার ব্যক্তিত্বে মাথা নত হয়ে যায়, আপোষহীন, সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি আপনার বন্ধু ছিলেন, লৌহের চেয়ে শক্ত, ইস্পাতের চেয়ে কঠিন, পাথরের চেয়ে জমাট চে গুয়েভারা আপনার বন্ধু ছিলেন। এমন বন্ধু-ভাগ্য কয়জনের আছে!

স্বার্থের টানে অনেকেই তার আদর্শ থেকে দূরে সরে এসেছে, নীতিকে দিয়েছে বিসর্জন, অর্থের মোহে তারা হয়েছে অর্থমূখী, কিন্তু আপনি আপনার আদর্শ থেকে একটুও বিচ্যুত হননি, সরে দাঁড়াননি আপনার অন্যধারার পথ থেকে। আপনাকে দেখে রাশিয়া, চীন এখন বেশ লজ্জাই পায়, নিচু করে ফেলে তাদের মাথাটা।

এই যে বিশ্ব এখন অস্থির পথে চলছে, জলবায়ুর পরিবর্তনে মানুষের

অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে, অস্ত্রের মহড়া চলছে এখন প্রতিটা দেশে, পারমানবিক বোমার দাপট দেখাতে চাচ্ছে যে যার মতো, সেখানে আপনি নিশ্চুপ, নিপাট ভদ্রলোকের মতো সবকিছু অবলোকন করছেন। অন্যকে বিপদে ফেলার কোনো বিদেশনীতি নেই আপনার, অন্যদেশকে চাপে ফেলার কোনো শক্তির প্রদর্শন নেই আপনার, কারো সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নেই, নেই কোনো অযথা নাক গলানোর বিকৃত স্বভাব।

আপনি যেমন আছেন তেমনই থাকুন। এই পৃথিবীর খুব কম মানুষই আছে সে তার নিজের মতো থাকতে পেরেছে। নিজের মতো থাকতে পারেননি আব্রাহাম লিংকন, নিজের মতো থাকতে পারেননি গর্বাচেভ, গাদ্দাফি, সাদ্দাম হোসেন। সাম্প্রতিককালে নিজের মতো থাকতে পারেননি বারাক হোসেন ওবামাও!

একদিন, অবশ্যই একদিন ওপার পৃথিবীতে আপনার প্রাণপ্রিয় বন্ধু চে গুয়েভারের দেখা হবে আপনার। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি আপনাকে দেখামাত্র বুকে জড়িয়ে ধরবেন—আপনি তার বন্ধু বলে নয়, আপনি আপনার আদর্শ, আপনার উদ্দেশ্য, আপনার পথ থেকে একটুও বিচ্যুত হননি বলে।

এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কষ্টকর। তারপরও বলি—আপনি আরো অনেকদিন বেঁচে থাকুন, যতদিন আপনার আদর্শ পরিপূর্ণ সফল না হয়। ভালো থাকুন কমরেড, ভালো থাকুন চিরঞ্জীব।

সাতদিন পূর্ণ হলো আজ ওরা বাড়ি ছেড়েছে—সৌম্য, পাভেল, যুথী, সুশান্ত আর বিন্তী। সিদ্ধান্তটা ওরা হঠাৎ করেই নিয়েছিল। কলেজে এসে খুব বিরক্ত মুখে সৌম্য একদিন বলল, 'চল, কোথাও ঘুরে আসি।'

বিন্তী উৎসাহ নিয়ে বলল, 'পিকনিক করবি?'

'ঠিক পিকনিক না, বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে ইচ্ছে করছে কয়েকদিন।' সৌম্যর চেহারায় আবারও বিরক্তির ছাপ।

'একা একা?'

'একা একা বোধহয় বেশি দিন ভালো লাগবে না।'

'তাহলে আমরাও যাই তোর সঙ্গে।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

চুপচাপ বসে ছিল যুথী এতক্ষণ। সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু একটা শর্ত আছে—বাসা থেকে কাউকে না বলে চলে যাব, যতদিন বাইরে থাকব যোগাযোগ করব না বাসার কারো সঙ্গে।'

'আমি যুথীর সঙ্গে একমত।' শপথ নেওয়ার মতো ডান হাত উঁচু

করে বলে পাভেল।

মাথা নিচু করে আছে সুশান্ত। ডান হাতের একটা আঙ্গুল কামড়াচ্ছে ও। ওর দিকে তাকিয়ে যুথী বলল, 'তোর কি খুব খিদে পেয়েছে, সুশান্ত?'

কিছু একটা ভাবছিল সুশান্ত। চমকে উঠে ও বলল, 'না তো!'

'তাহলে ওভাবে নখ কামড়াচ্ছিস্ কেন?'

'তোরা হয়তো বাসার কাউকে কিছু জানাবি না, কিন্তু আমার তো কাউকে জানানোরই নেই।' মাথাটা আবার নিচু করে ফেলে সুশান্ত।

যুথী উঠে গিয়ে সুশান্তর পাশে বসে। আলতো করে কাঁধে একটা হাত রাখে ওর, 'আমাদেরও কেউ নেই রে। অন্তঃসারশূন্য কাউকে জানানোও যা, না জানানো তা।'

কলেজের মাঠে সবুজ ঘাস, পাভেল একটা ঘাস ছিড়ে মুখে দিতে দিতে বলল, 'তাহলে প্রথমে আমরা কোথায় যাব?'

বিন্তী বলল, 'কক্সবাজার।'

সুশান্ত বলল, 'না, সেন্টমার্টিন।'

সঙ্গে সঙ্গে সৌম্য হাত উঁচু করে বলল, 'আমি সুশান্তকে সমর্থন করলাম, সমর্থন করলাম, সমর্থন করলাম।' অবশেষে সমর্থন করল সবাই।

'তাহলে আমাদের ডেটলাইন কবে?' যুথী জিজ্ঞেস করল।

'সিদ্ধান্তটা যেহেতু হঠাৎ করে নেওয়া হয়েছে, সুতরাং আমরা যাবও হঠাৎ করে।' যুথী একটু থেমে বলে, 'কালকে।'

'কালকেই!' বিন্তী চমকানোর ভাব করে।

'কেন, তোর কোনো সমস্যা আছে?'

'ঠিক সমস্যা না, একটু প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যাপার আছে না।'

যুথী গলাটা গম্ভীর করে বলে, 'কী ধরনের প্রস্তুতি?'

বিন্তী যুথীর দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ দুটো নামিয়ে বলল, 'আমার হাতে তেমন কোনো টাকা নেই, ব্যাংক থেকে তুলতে হবে। কিন্তু কাল তো ব্যাংক বন্ধ।'

'ব্যাংকে তোর কত টাকা আছে?' যুথী হাসতে হাসতে বলে।

'আছে।' টাকা-পয়সা তুচ্ছ ব্যাপার এমন অবজ্ঞার স্বরে বিন্তী বলে, 'ভালোই আছে।'

'টাকা যাই থাক, তোর সব টাকার এগেনেস্টে আমি এক লাখ টাকা লোন দিচ্ছি তোকে, সুদমুক্ত লোন। চলবে?'

'এত টাকা তো লাগবে না।'

'না লাগুক, নিবি। তোর তো তাও কিছু লাগবে, যারা বান্ডিল বান্ডিল টাকার মালিক তারা কিন্তু সবচেয়ে বেশি লোন নেয়। তারা বাড়ি কিনতে লোন নেয়, গাড়ি কিনতে লোন নেয়, ব্যবসা শুরু করতে লোন নেয়। কেন এসব লোন নেয় জানিস? কারণ একটাই—ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া। সবাই এটা জানে—ব্যাংক জানে, ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানে, সরকার জানে, ট্যাক্স আদায় করে যারা তারা জানে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। কী অদ্ভুত একটা নিয়ম। প্রকাশ্যে চুরি করার মতো একটা ব্যাপার, যেটাকে সবাই স্বীকৃতি দিয়েছে।' যুথী একটু থেমে বলল, 'অবশ্য সমস্ত পৃথিবীটাই চলছে লোনের ওপর। ধনী দেশ গরিব দেশকে লোন দেয়। দিয়ে বলে, ওই টাকা দিয়ে আমার দেশকে কিছু জিনিস কিনে নাও, কিছু আমাদের কনসালটেন্সি ফি দাও, বাকী যা আছে দেশে নিয়ে গিয়ে ভাগাভাগি করে খাও। তারপর বছর শেষে লোন শোধ করতে না পারলে আবার লোন দেয়, দিয়ে বলে, জিনিসপত্র কেনো, পরামর্শ ফি দাও, বাকী টাকাগুলো হাপিস করে দাও। সবশেষে যখন অনেক ঋণগ্রস্ত হয়ে যায় দেশটা তখন ওই ধনী দেশ বলে, এবার আমার কথা শোনো, আমি যেভাবে বলব সেভাবে দেশ চালাবে। না হলে...। যুথী আবার থেমে বলল, দাসপ্রথার কী অদ্ভুত ডিজিটাল প্রচলন!'

'আমরা তাহলে আগামীকালই যাচ্ছি?' সৌম্য বলল।

'কিন্তু হোটেল বুকিং দিতে হবে না?' বিন্তী উদ্বিগ্ন হলে বলল।

'হোটেল বুকিং দিতে হবে কেন? এখন তো তেমন শীত পড়েনি।'

পাভেল বিন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অধিকাংশ হোটেলই খালি পাওয়া যাবে এখন, কোনো সমস্যা হবে না।'

'যদি না পাওয়া যায়!'

'অসুবিধা কী, সারারাত সমুদ্রের ধারে বসে কাটাব। ভাগ্যিস, যদি কোনো মৎস্য কন্যার দেখা পাই, তাহলে—।' পাভেল কথাটা শেষ না করে খিকখিক করে হাসতে থাকে।

'মৎস কন্যার দেখা পেলে কী হবে?' যুথী গম্ভীর মুখে বলে।

পাভেল চোখ বড় বড় করে বলল, 'ওভাবে চোখ-মুখ শক্ত করে সিরিয়াসলি কথা বলছিস কেন? তোদের নিয়ে হচ্ছে ওই একটা সমস্যা। সবকিছুতেই প্রথমে তোরা বাজে জিনিসটা ভাবিস। মৎস কন্যার দেখা পেলে বলব, আপা, তোমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও কি একজন মেয়ে? যদি বলে,

হ্যাঁ, আমি তখন বলব, আমাদের দেশেও আমরা পরপর দু দুটো মহিলা প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি। কিন্তু তোমরা যতটা মুক্ত মনে ঘুরে বেড়াও, তোমরা যতটা নিরাপদ, আমাদের দেশের মেয়েরা এখনো ততটা নিরাপদ না, রাস্তায় তো নয়ই, ঘরের ভেতরও না।'

পাভেলের একটা হাত চেপে ধরে যুথী বলল, 'স্যরি, এক্সট্রেমলি স্যরি। জানিস, তুই এখন যে কথাটা বললি, অধিকাংশ পুরুষ সেটা বোঝে না। বুঝলেও মুখ ফুটে কখনো বলে না।'

'আমরা কীসে যাব? টিকেট কাটতে হবে তো?' সুশান্ত সোজা হয়ে বসে বলল, 'যদি চিটাগাং পর্যন্ত ট্রেনে যাই, তাহলে ট্রেনের টিকেট কাটতে হবে। আমার এক কাকা আছে, তাকে বললে টিকেট ম্যানেজ করে রাখবে।'

'ট্রেনেই যাব।' উচ্ছ্বসিত হয়ে যুথী বলল, 'আমি কোনো ট্রেনে চড়িনি। ট্রেনে চড়ার শখ আমার অনেকদিনের।'

'আমরা ট্রেনেই যাব, কিন্তু কোনো টিকিট কাটব না।' সৌম্য হাসতে হাসতে বলল, 'একটা টিকিটও না।'

'বলিস কি!' বিন্তী ভয় ভয় গলায় বলল, 'পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে তো!'

'পুলিশ ধরলে তো খুব ভালো, সবগুলো টিকিট কিনতে যত টাকা লাগবে তার অর্ধেক টাকা ট্রেন থেকে নেমে পুলিশকে দিলেই সব সমস্যার সমাধান। কিন্তু আমরা ধরাও পড়ব না, পুলিশকে কোনো টাকাও দেব না, আমরা করব অন্য একটা কাজ।' সৌম্য আবার হাসতে থাকে।

বিকেল পাঁচটার ট্রেনে ওরা চট্টগ্রাম যাবে। যুথী, সৌম্য আর সুশান্ত আগেই পৌঁছে গেছে স্টেশনে, কিন্তু বিন্তী আর পাভেলের আসার কোনো নাম গন্ধ নেই। সৌম্য বলল, 'ওরা বোধহয় বাসা থেকে বের হতে পারেনি।'

'বের হতে না পারার কোনো কথা না।' সুশান্ত বলল।

'হয়তো ব্যাগ গুছানো দেখে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছে কোথায় যাওয়া হচ্ছে, ভালো করে উত্তর দিতে পারেনি। বাসা থেকে বের হতে দেয়নি তাই।' যুথী চিন্তিত মুখে বলল।

'আচ্ছা—।' পকেট থকে মোবাইল বের করে সৌম্য বলল, 'মোবাইল করে দেখি না।'

সৌম্যকে বাধা দিয়ে যুথী বলল, 'কিছুক্ষণ আগে আমি করেছিলাম, মোবাইল বন্ধ ওদের।'

'মোবাইল বন্ধ কেন?'

যুথী হেসে বলল, 'বন্ধ করার আগে সেটা তো আমাকে বলেনি।'

সুশান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি স্টেশনের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি, ওরা আসে কিনা।'

'আমিও যাই তোর সঙ্গে।' সৌম্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল। সঙ্গে সঙ্গে যুথী বলল, 'তোরা দুজনই চলে গেল আমি এখানে থেকে কী করব?'

'আমাদের ব্যাগগুলো পাহারা দে।'

'তার চেয়ে বরং একটা কাজ কর, আমাকে একটা ভাঙা থাল এনে দে, একা একা বসে থেকে তো ভালো লাগবে না, স্টেশনে বসে বসে ভিক্ষা করি।' যুথী মেজাজ খারাপ করে বলল।

সুশান্ত আবার যুথীর পাশে বসে বসে বলল, 'সৌম্য, তুই যা, আমি ওর পাশে বসি।'

সৌম্যকেও যেতে হলো না। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে পাভেল আর যুথী হাসতে হাসতে এদিকে আসছে। কাছে আসতেই যুথী লাফিয়ে উঠে বলল, 'আগে বল, তোদের মোবাইল বন্ধ কেন?'

পাভেল যুথীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আমার মোবাইলটা চুরি হয়ে গেছে! ওরটা বাসায় রেখে এসেছে।'

'বাসায় রেখে এসেছিস কেন?' যুথী বিন্তীর দিকে তাকায়।

'তোরা না বললি বাসার কাউকে বলা যাবে না, যতদিন বাইরে থাকব যোগাযোগও করা যাবে না কারো সঙ্গে। যোগাযোগই যখন করা যাবে না তাহলে মোবাইল এনে লাভ কী? তাই বন্ধ করে বাসায় রেখে এসেছি সেটা।'

'ভালো করেছিস।' যুথী মেজাজ খারাপ করেই বলল, 'কিন্তু এত দেরি হলো কেন তোদের?'

'কুল ম্যান, কুল।' পাভেল যুথীর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'রিকশায় করে আসছিলাম, মাঝপথে পকেটে হাত দিয়ে দেখি মোবাইল নেই। ভাবলাম, রাস্তার কোথাও পড়ে গেছে। রিকশা ঘুরাতে বললাম রিকশাওয়ালাকে। কিন্তু অনেক খুঁজেও পেলাম না।'

'হ্যাঁ, মোবাইলটা রাস্তায় পড়ে গেছে, কেউ সেটা দেখে নিজের পকেটে না তুলে তোর জন্য সেখানে রেখে দিয়েছে!'

'নতুন মোবাইল তো, কয়েকদিন আগে কিনেছিলাম।'

'বিন্তীর সঙ্গে দেখা হলো কোথায়?'

বিন্তী একটু এগিয়ে এসে বলল, 'আমিও রিকশা নিয়ে আসছিলাম। রাস্তার মাঝখানে ওকে দেখে তুলে নিয়ে আসি।'

ট্রেনের হুইসেল বাজছে। একটু পরেই ট্রেনটা ছাড়বে। বিন্তী বলল, 'আমরা কত নাম্বার কম্পার্টমেন্টে উঠব?

'আমরা নাম্বার পাব কোথায়, আমরা টিকিট কেটেছি নাকি!' যুথীর মেজাজ এখনো একটু একটু খারাপ আছে, 'একটাতে উঠলেই হয়।'

সবাই একসঙ্গে ট্রেনে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল ট্রেনটা। ছয়ঘন্টা পর চিটাগাংয়ে নেমে সৌম্য বলল, 'কী বুঝলি? আমরা প্রায়ই পত্রিকাতে দেখি এ সরকারি প্রতিষ্ঠানে লস, ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে লস। লস কেন হয়, এবার বুঝলি তো? আমাদের মতো তরতাজা পাঁচটা মানুষ বিনা টিকিটে ছয় ঘণ্টা পার করলাম, কিন্তু কেউ এসে বলল না, আপনাদের টিকিট কই? এ দেশটার মতো এসব প্রতিষ্ঠানও কেউ দেখার নেই, একজনও নেই।'

চিটাগাংয়ের টিকিট কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে পাঁচটা টিকিট কিনল সৌম্য, তারপর সেগুলো ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, 'এবার ধরে নে টিকিট আমরা কেটেছি, অন্তত টাকাগুলো তো জমা হলো রেলের ফান্ডে। তারপর এ টাকা দিয়ে কেউ বিদেশ ভ্রমণ করুক, নিজের বাড়ি সাজাক কিংবা ফূর্তি-আয়েশে সব উড়িয়ে দিক, আপাতত আমাদের তা না দেখলেও চলবে।'

সেন্টমার্টিনে যেতে ওদের আরো দুই ঘণ্টা লাগল। সেখানে ওরা পাঁচদিন ছিল। ওই কয়দিনে যুথী ভুলতে চাইল ওর ঘুষখোর বাবার কথা, সৌম্য ভুলতে চাইল ওর মুখোশ পরা মায়ের নির্মমতা, পাভেল ভুলতে চাইল ওর বাবার ভণ্ডামি, বিন্তী ভুলতে চাইল ওর মায়ের লোভাতুর চেহারা, আর সুশান্ত ভুলতে চাইল ওর পরিবারের পালিয়ে যাওয়া রাতের অন্ধকার।

পাঁচদিন পর সীতাকুণ্ডে চলে আসে ওরা, ঢাকায় ফিরবে কাল বিকেলে। কিন্তু এ সাতদিনে আসল সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছে ওরা। ঢাকায় পৌঁছেই কোনো কিছুর দিকে তাকাবে না, কোনো কিছু ভাববে না, ওদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে কাজটা করবে, তারপর...। তারপর ওরা আর কিছু ভাবতে চায় না। কেবল ওরা টের পায় শরীর কাঁপছে ওদের পাঁচজনেরই, বুকের ভেতরটাও কাঁপছে ধুক ধুক করে, শিরশির করছে চোখে পাতা। দূরে তাকানো সুশান্তের চোখ দুটো ভিজে ওঠে তখন অল্প অল্প। বাবা-মাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তার, এখনই, এ মুহূর্তে।

মো. আহমেদিনেজাদ
প্রেসিডেন্ট
তেহরান, ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান

জনাব

পরপর দুবার ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আপনি। আপনাকে অভিনন্দন। দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার পর কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল আপনার বিরুদ্ধে। আপনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এই নিয়ে মাঠও গরম করে ফেলেছিল। কিন্তু আপনি সেটা উতরে এসেছেন, খুব ভালোভাবেই উতরে এসেছেন।

সম্ভবত আপনি জানেন, সম্ভবত কেন নিশ্চয়ই জানেন, প্রতিটা রাষ্ট্রনায়ককেই জানতে হয়—প্রতিটা দেশের বিরোধীদল যদি খুব বেশি চিৎকার শুরু করে তাহলে বুঝতে হবে, সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রদের সম্পর্ক খারাপ কিংবা ক্ষমতাধর রাষ্ট্ররা তাদের স্বার্থ মেটাতে পারছে না অথবা অভ্যন্তরীণ একটা চাপে রেখে তাদের লেজুড়বৃত্তি করার কথা আভাসে-ইঙ্গিতে বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনার যে ব্যক্তিত্ব, আপনার যে চরিত্র, তাতে এরকম কোনো চাপে আপনি নত হবেন বলে মনে হয় না।

পারমানবিক বোমার মালিক হওয়ার জন্য আপনি উঠে পড়ে লেগেছেন। কেউ স্বীকার করুক অথবা না করুক, অনেকে বলেন মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র ইসরাইলের কাছেই সেই ধরনের বোমা আছে। অবশ্য আরব বিশ্বে আর কারও কাছে এসব থাকার কথা না, তারা চিন্তাও করতে পারে না এ ধরনের বোমার মালিক তারা হবে। তাদের দুর্বল শাসন ব্যবস্থা, ভোগ-বিলাসী মন, রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ে টিকে থাকার জন্য অন্যদেশ বিশেষ করে মার্কিন সেনাদের দারস্থ হতে হয়, তাদের হুকুম মতো চলতে হয়, তাদের প্রহরায় নিরাপদ বোধ করতে হয়। সেখানে আমেরকিার প্রিয় বন্ধু ইসরাইল কোনো কারণে শঙ্কিত বোধ করুক আমেরিকা সেটা চাইবে না, তাই তার পদলেহন করা কোনো রাষ্ট্রকেও পারমানবিক বোমার মালিক হওয়ার কথা চিন্তাও করতে দেবে না। আরব বিশ্বে অধিকাংশ রাষ্ট্র যখন

আমেরিকার সামনে হাত কচলায়, আপনি সেখানে মাথা উঁচু করে থাকেন; তারা যখন মুখে কাপড় গুঁজে থাকে, আপনি তখন জানিয়ে দেন তার নোংরামির কথা; তারা যখন ভয়ে কুঁকড়ে থাকে সারাক্ষণ, আপনি তখন বীরদর্পে ঘোষণা দেন—আমিও আছি, আমার দেশও আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই যে পারমানবিক বোমার মালিক হচ্ছে বা এরই মধ্যে হয়েছে আপনার দেশ, এই বোমাটা কার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন? এটা যার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হোক না কেন সেটা হয়তো কোনো বনে বাস করা প্রাণীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে, নয়তো প্রকৃতির কোনো কিছুর ওপর ব্যবহার করতে হবে, কিংবা মানুষের ওপর ব্যবহার করতে হবে। মনে রাখবেন, এদের কারো ওপর ব্যবহার করার অধিকার আপনার নেই। আর যারা ব্যবহার করার চিন্তা করে তারা করুক, কিন্তু সেই চিন্তাটা আপনার সাজে না। সবারই হাত-পা আছে, কিন্তু সবাই মানুষ না। একটা পারমানবিক বোমা ব্যবহার করা মানে মানবতার মৃত্যু, মনুষ্যত্বের স্খলন, মানবিক পরাজয়!

সারাবিশ্বের মানুষ এখন স্বাধীন, মেয়েরাও। কিন্তু ইরানের মেয়েরা কতটুকু স্বাধীন? তাদের কতটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে আপনার দেশ? একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা উচিত—মানুষকে বন্দি রেখে কখনো কোনো সভ্যতা সৃষ্টি হয় না, মেয়েদেরকে তো নয়ই।

আপনি সাহসী, আপনি খুব সুন্দর করে কথা বলেন, আপনার আচরণের মাঝে নেতৃত্ব দেওয়ার একটা গুলাবলীও আছে। আরব বিশ্ব এখন পদলেহিত হতে হতে শুয়ে পড়েছে মাটির সঙ্গে, তাদের এখন মিশে যাওয়ার যোগাড়। একজনকে তো সেই জায়গা থেকে জাগাতে হবে তাদের, একজনকে তো মাথা উঁচু করে ঘোষণা করতে হবে—স্টপ! সেই মানুষটা আপনিই। কাউকে আর দেখতে পাচ্ছি না আমরা এ মুহূর্তে।

ট্রেন থেকে ওরা যখন ঢাকায় নামলো রাত তখন বারোটা। দুদিনই বেশ শীত পড়েছে সারাদেশে, ঢাকাতেও। কমলাপুর স্টেশনে জটলা করে শুয়ে আছে কয়েকশ' মানুষ। শীতে কাতর মানুষগুলো হাত-পা গুটিয়ে নিজের ভেতর যেন নিজেই ঢুকে যেতে চাইছে, কেউ কেউ শুয়ে আছে পাটের চট কিংবা পুরাতন কোনো তেল চিটচিটে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে।

যুথী একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিস?' এটুকু বলেই থেমে যায় যুথী। স্টেশনের কোণায় শুয়ে থাকা একটা লোকের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল, 'চারদিকে এত মশা, কিন্তু এদেরকে কোনো মশা কামড়াচ্ছে না।' পাশে দাঁড়ানো সৌম্যর দিকে তাকিয়ে যুথী গম্ভীর গলায়

বলল, 'কেন, বল তো?'

'ঢাকা শহরে এত নাদুস-নুদুস মানুষ, এত টকটকে রক্ত তাদের শরীরে, ওই সব ছেড়ে এসব পানসে রক্ত খাবে নাকি ওরা! ওদের একটা রুচি আছে না!'

'ব্যাপারটা তা না।' সুশান্ত যুথীর পাশে এসে বলল, 'তুই কি তোর বাবা-মা-ভাই-বোনের কিছু চুরি করবি?'

'মোটেই না।'

'মশা-মাছিও ওদের মনে করে বাবা-মা। নোংরা, ময়লা, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় একসঙ্গে থাকে তো। তাই হয়তো শরীরের রক্ত চুরি করতে বিবেকে বাধে ওদের। কিংবা এমনও হতে পারে মাটিতে শুয়ে থাকা ওইসব নিরীহ মানুষদের দেখে মায়া হয় ওদের, যেমনটা হয় না মাথার ওপর বসে থাকা নাদুস-নুদুস মানুষদের।'

'আজকের রাতটা এখানে কাটালে কেমন হয়?' পাভেল পেছনে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, সামনে এগিয়ে এসে বলল।

'আমি রাজী।' খুব আনন্দ নিয়ে বলল বিন্তী।

'কিন্তু তুই এক মিনিটও টিকতে পারবি না।' সৌম্য বিন্তীর মাথায় একটা টোকা দিয়ে বলল, 'তুই তো মশাদের প্রতিবেশী না, আর তোর শরীরের রক্তও ওদের মতো পানশে না, সুস্বাদু, টকটকে। তোকে ওরা এক মিনিটেই শুষে ফেলবে।'

'ফেলুক।' বিন্তী আবার আনন্দ নিয়ে বলল, 'এখানে একটা রাত শুয়ে থেকে অন্তত এটা বুঝতে চাই, জীবনের অন্য আরেকটা দিক আছে।'

পাশে তাকিয়ে যুথী বেশ চমকে উঠে বলল, 'দেখ দেখ।'

যুথীর তাকানো অনুসরণ করে সবাই তাকালো। মাঝবয়সী একটা লোক ছেঁড়া একটা কাঁথা গায়ে বসে আছে, তার কোলে একটা কুকুর। কুকুরটাকেও জড়িয়ে রেখেছে সে কাঁথা দিয়ে। লোকটা ঘুমায়নি, তাকিয়ে আছে সে তাদের দিকে, কুকুরটাও।

কিছুটা দৌড়ে গিয়ে যুথী লোকটার সামনে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ ভালো করে কুকুর এবং মানুষ দুটোকেই দেখে বসে পড়ল ওদের সামনে। গালে হাত দিয়ে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে লোকটাকে হেসে হেসে বলল, 'কুকুরটা কি আপনার পোষা কুকুর?'

'না।'

'তাহলে ওভাবে কোলে নিয়ে আছেন যে।'

'শীত পড়ছে তো। দুদিন আগে দেখি কুকুরটা শীতে কাঁপতাছে, মায়া হইল, তাই নিজের কপড়ের নিচে রাখলাম।' লোকটা কাঁথাটা আরো টেনে টুনে গায়ে দেয়, কুকুরটাকেও ভালো করে জড়িয়ে ধরে আরো।

'কিন্তু ঘুমাচ্ছেন না কেন আপনি?'

'খ্যাতাটা ছোট তো, দুইজনে ধরে না। তাই বইস্যা আছি।'

'ঘুম আসে না?' যুথী বসে পড়ে স্টেশনের ওপর।

'আসে। বইস্যা বইস্যাই ঘুমাই। কোনো সমস্যা হয় না। জগতের অনেক প্রাণীই বইস্যা ঘুমায়, কোনো অসুবিধা হয় না।'

'একটা কুকুর নিয়ে বসে আছেন, ঘৃণা লাগে না?'

'না। বরং একটা মানুষ নিয়া বইস্যা থাকলেই ঘৃণা লাগত।'

'কেন!' যুথী একটু শব্দ করে বলে।

'বছর তিনেক আগে টেরেন থাইক্যা একটা লোক নামল। তারপর খালি সারা স্টেশন ঘোরাফেরা করে। কোথাও বসেও না, শোয়ও না। ডাইক্যা আইন্যা জিজ্ঞাস করি। কয়, খিদা লাগছে। খাওন দেই তারে, শুইতেও দেই। কিন্তু সকালে উঠে দেখি আমার সব কিছু চুরি কইর‍্যা পালাইয়া গেছে ও।' লোকটা খিকখিক করে হেসে বলল, 'মানুষ মানুষের ক্ষতি করে, কুত্তা কখনো করে না।'

মনটা খারাপ হয়ে যায় যুথীর। লোকটার সামনে অনেকক্ষণ বসে থাকে ও—মানুষের চেয়ে তাহলে কুকুর এখন বিশ্বাসী! যুথী মনে মনে ভেবে ফেলে, পরজনমে সে কুকুর হয়ে জন্মাতে চাইবে।

চিৎকার করে একটা লোক এগিয়ে আসছে এদিকে। যুথী উঠে দাঁড়ায়। লোকটা সোজা এসে যুথীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মাই'সান, সত্যি করে বলো তো, আমাকে কি নেশাড়ু বলে মনে হচ্ছে?'

কিছু বলে না যুথী। ভীষণ ভয় পেয়েছে সে। কিন্তু ওকে দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সামনে দাঁড়ানো দোদুল্যমান লোকটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ও। লোকটা হঠাৎ বেশি রকম ভাবে টলে উঠে বললেন, 'নেশাড়ু বুঝেছ তো? ওই যে নেশা করে। অবশ্য যারা নেশা করে তাদেরকে নেশাখোর বলা হয়, আমি বললাম নেশাড়ু। একটা শব্দ বানালাম আর কি। রবীন্দ্রনাথ এরকম কত শব্দ বানিয়েছেন! আমি না হয় একটা বানালাম। তা, মা জননী, তুমি কি বলতে পারবে দক্ষিণ দিকটা কোন দিকে?'

'আমি তো এই স্টেশনে নতুন এসেছি। তাই বুঝতে পারছি না কোনটা দক্ষিণ কোনটা উত্তর।'

'তুমি কি দেশের বাইরে থাকো নাকি?'

'না।'

'তাহলে যে বললে এই স্টেশনে নতুন এসেছ?'

'না মানে, ট্রেনে করে তো কখনো কোথাও যাইনি, তাই এই স্টেশনটাও দেখা হয়নি।' যুথী একটু থেমে বলে, 'দক্ষিণ দিকে কী আছে?'

'আমার বাসা আছে, আমি এখন বাসায় যাব। অবশ্য বাসায় যাওয়াও যা, না যাওয়াও তা। বাসায় কেউ নেই তো।'

'কোথায় গেছে সবাই?'

'সবাই উড়ে গেছে, পাখির মতো ফুড়ুৎ করে উড়ে গেছে। বড় হয়ে গেছে তো সবাই। যার যার বউ, যার যার স্বামী নিয়ে সে সে চলে গেছে। আর আমাকে ফেলে গেছে একা। অথচ জানো—।' লোকটা একটা হিক্কা তুলে বললেন, 'প্রতিটা ছেলে-মেয়েকে নিজের রক্ত পানি করে মানুষ করেছি। নিজে না খেয়ে ওদের খাইয়েছি, নিজে না পরে ওদের পরিয়েছি। কিন্তু লাভটা কি হলো, বিড়ালের বাচ্চা যেমন বড় হলে বিড়ালকে ছেড়ে চলে যায়, কুকুরের বাচ্চা যেমন বড় হলে কুকুরকে ছেড়ে চলে যায়, মানুষের বাচ্চাও তেমন যায়। তাহলে মানে কি দাঁড়াল? কুকুরও যা, মানুষও তা। এই মেয়ে, আমি যে এত বক বক করছি তোমার খারাপ লাগছে না?'

'না।'

'ভালো লাগছে?'

'জ্বি।'

'এই তো একটা মিথ্যা কথা বললে। অধিকাংশ মানুষ প্রয়োজনের সময় সত্য কথাটা বলতে পারে না। আমি জানি, তোমার এখন খারাপ লাগছে। একা মানুষ তো, কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি না, তাই সারাক্ষণ বক বক করি।'

'আন্টি, আই মিন আপনার স্ত্রী—।' যুথী আগ্রহ চোখে লোকটার দিকে তাকায়।

'সেই কবেই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। বেঁচে গেছে, না হলে ছেলে-মেয়ের এরকম আচরণ দেখে বেঁচে থাকলেও এতদিন মরে যেত। আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো—আমাকে সত্যি সত্যি নেশাড়ু লাগছে?' লোকটা সবার

দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, 'এরা তোমার কে হয়?'

'আমার বন্ধু।'

'খুব ভালো। আমি তাহলে আসি। দক্ষিণ দিকটা আগে খুঁজে বের করতে হবে আমার, তারপর বাসা। ভীষণ ঘুম পেয়েছে।' টলতে টলতে লোকটা চলে যান। যুথীর আবার মন খারাপ হয়ে যায়।

'চল তো, স্টেশনের ভেতর আর ভালো লাগছে না।' পাভেল এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আজ রাস্তায় রাস্তায় একটু ঘুরব, রাতের ঢাকা দেখব।'

জন্ডিস আলোয় ছেয়ে গেছে ঢাকার রাস্তা। সবকিছু কেমন যেন হলুদ হলুদ। সবাইকে দেখে মনে হয় জন্ডিসের রোগী। বিন্তী বেশ বিরক্তি নিয়ে বলল, 'রাস্তায় এ ধরনের লাইট লাগানোর মানে কী?'

'যে লাগিয়েছে সেই জানে।' সৌম্য ও বিরক্তি নিয়ে বলে।

'রাত হলে ঢাকার অনেক রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়, কোন রাস্তায় হাঁটব আমরা?' সুশান্ত চারপাশে একবার তাকিয়ে বলে।

'তার আগে খেতে হবে। খুব খিদে পেয়েছে।' পাভেল পেটে হাত দিয়ে বলে, 'সেই কখন খেয়েছি। শালার রেল কর্তৃপক্ষ, খালি সেবা দেওয়ার কথাই বলে। ভালো একটা ক্যান্টিন নেই ট্রেনের ভেতর। কীসব হাবিজাবি খাবার, দেখলেই বমি আসে।'

'খাবারের মান নিয়েও সন্দেহ হয়। এখন তো রোকন উদ দৌলা নেই, খাবার পরীক্ষা করার মোবাইল কোর্টে কে আছেন?' যুথী বলল, 'তাকে একটু খবর দেওয়া দরকার। বলা দরকার—ও হে আঙ্কেল, দেখে যান দেশের সরকার পরিচালিত যানবাহনে বিক্রি করা খাবারে খাওয়ার উপযোগী খাবার আছে কতটুকু?'

'পুরান ঢাকার কোনো একটা হোটেলে গেলে কেমন হয়?' বিন্তী যুথীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওখানকার খাবারগুলোর খুব স্বাদ হয়।'

'খারাপ হয় না।' সৌম্য বিন্তীর দিকে সরে এসে বলল, 'অনেকদিন আগে খেয়েছিলাম। ভালো কথা, আলাউদ্দিন রোডের মোড়ে কীসের জানি বিরিয়ানির দোকান আছে?'

'হাজির বিরিয়ানি?' সুশান্ত বলল।

'আরে না। আরো ভালো বিরিয়ানি পাওয়া যায় পুরান ঢাকায়। আমি একদিন খেয়েছিলাম। নামটা মনে পড়ছে না।'

'চল তো আগে ওখানে।'

আলাউদ্দিন রোডের মাথায় এসেই থমকে দাঁড়ায় সৌম্য। পানির একটা পাইপ ফেটে গেছে, ছোট একটা গর্ত হয়ে গেছে রাস্তার পাশে। মুক্ত হস্তে দান করার মতো মুক্ত মনে পানি বের হচ্ছে সেখান দিয়ে। কিন্তু কেউ দেখার নেই। সিটি কর্পোরেশনের কোনো কর্মচারি কিংবা মেয়র, সবাই ব্যস্ত। কিন্তু কেউ দেখছে না পানির এই নিদারুণ অপচয়।

'এটা দেখেই থমকে দাঁড়ালি!' যুথী সৌম্যর পাশে দাঁড়িয়ে বলে, 'কয়েক বছর ধরে ঢাকার মেইন মেইন রাস্তার পাশে ময়লা ফেলার বড় বড় লোহার কনটেইনার দেখা যায়, কিন্তু মানুষ ওর ভেতর ময়লা ফেলে না। আশপাশে ময়লা ফেলে স্তুপ করে রাখে। রাস্তায় মানুষ চলতে পারে না, গাড়ি জ্যাম হয়, সবাই ব্যাপারটা জানে, দেখে, কিন্তু কেউ কিছু বলে না।' যুথী হাসতে হাসতে বলল, 'টাকা মারতে মারতে একেকজনের তো পেট কয়েক ফুট বড় হয়ে গেছেই, চোখের পাতাতেও চর্বি জমেছে তাদের। সেই চর্বিওয়ালা পাতা নিয়ে চোখ মেলে তাকানো তো খুবই মুশকিল, এসব দেখবে কী করে তারা?'

সৌম্য যে হোটেলটাতে খেয়েছিল, খুঁজে পেল না ওরা সেটা। অনেকগুলো হোটেল আছে এখানে। সবগুলো হোটেলের সামনে মুরগি ছিলে রেখে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, কোনো কোনোটাতে আস্ত একটা ছাগলও ঝুলানো আছে। যুথী অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'একটু ভালো করে তাকা। রাষ্ট্রের কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে অদৃশ্য একটা দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে এভাবে, আমরা নড়তেও পারছি না, কিছু বলতেও পারছি না। আমরা কেবল ঝুলেই আছি, যেন মহাকাল পর্যন্ত ঝুলে থাকতে হবে আমাদের, এভাবে, মৃতের মতো!'

ভ্লাদিমির পুতিন
প্রধানমন্ত্রী
মস্কো, রাশিয়া

জনাব

দুই পরাশক্তির এক শক্তি ছিল আপনার দেশ—সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেটা এখন ইতিহাস, বুক জ্বালা করা ইতিহাস। সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কয়েক টুকরো। সেই শক্তিও নেই, নেই সেই দাপটও।

সারা বিশ্ব একটা ভারসাম্যর মধ্যে ছিল, যখন পরাশক্তি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। মূলত তখন দু ভাগে ভাগ ছিল বিশ্বটা। এক দল পদলেহন করত আমেরিকার, আরেক দল করত সোভিয়েত ইউনিয়নের। ইচ্ছে করলেই কোনো দেশের প্রতি অন্য একটা দেশ যা খুশি তাই করতে পারত না। প্রতিটা দেশের মধ্যে এক ধরনের সাম্যতা ছিল, সম্মান ছিল, প্রতিযোগিতা থাকলেও এক সাথে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব ছিল। লেলিনের দেশ বলে অনেকে এটা নিয়ে গর্বও করত। সেই গর্বও এখন ভেঙে গেছে লেলিনের মূর্তির মতো, পুরো সোভিয়েত রাশিয়ার মতো।

সমাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের বিরোধ সেই আদিকাল থেকেই। তারপরও যে কথাটা সত্য—গণতন্ত্রীরা কোনো কানো সময় সমাজতান্ত্রিক সাজে, সমাজতান্ত্রিকরা কখনো কখনো গণতান্ত্রিক সাজে। আসলে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য একজন নেতাকে, একজন ক্ষমতাশালীকে, একজন রাষ্ট্রনায়ককে মাঝে মাঝেই খোলস পাল্টাতে হয়, নিজেকে বানাতে হয় ভাঁড়। ইদানীং পতিত ক্ষমতাবানরা, বিশেষ করে আপনাদের মতো রাষ্ট্রনায়কদের ভাঁড়ই মনে হয় আমাদের। আফগানিস্তান ধুলোয় মিশে যাচ্ছে, ইরাকে প্রতিদিন আগুন জ্বলছে, ফিলিস্তিনিরা হচ্ছে ঘর হারা, ইসরাইল মানুষ মারছে মশার মতো, আমেরিকা যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে বিশ্বময়, আর আপনারা আপনাদের বুড়ো আঙ্গুল চুষছেন বাচ্চাদের মতো! জাতিসংঘে কিছু কথা ওঠে, অনেক কিছুর সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়, তারপর শেষে আমেরিকা যাহা বলে তাহাই হয়। আপনাদের মোসাহেবি ভূমিকা দেখতে দেখতে বিশ্বের অবহেলিত মানুষজন অভিশম্পাত করে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত, প্রতিক্ষণ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আমাদের কিছু কৃতজ্ঞতা আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমেরিকা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য সপ্তম নৌবিহার পাঠিয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন সেটা প্রটেক্ট দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিল অষ্টম নৌবিহার। শেষে পিছু হটে আমেরিকা। নাহলে স্বাধীনতা পেতে হয়তো আমাদের আরো কিছু রক্ত ঝরাতে হতো।

আপনার খারাপ লাগে না মি. পুতিন—এই যে এতো ঐশ্বর্যময়, দাপুটে একটা দেশ ছিল আপনাদের দেশটা সেটা এখন দাঁত-নখ ছাড়া বাঘের মতো হয়ে গেছে, এটা এখন সামান্য হলেও অন্য দেশকে তোষামোদ করে চলে, যে দেশ পুজিবাদের অনেক কিছুর সঙ্গে বেশ কিছু অসভ্য ছোঁয়া পেয়েছে ?

আপনি একদিন চুপি চুপি মহামতি লেলিনের মূর্তির কাছে যান, দেখবেন—তিনি আপনাদের অভিশাপ দিচ্ছেন। আপনি দস্তভয়স্কির সমাধিসৌধের কাছে যাবেন, শুনবেন—তিনি আপনাদের দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসছেন।

তারপর একদিন আপনিও ইতিহাস হয়ে যাবেন, তখন কেউ মনে রাখবে না আপনাকে। মানুষ তাকেই মনে রাখে-যে বীর, পরাজয় জেনেও যে যুদ্ধ করে। আপনারা যুদ্ধ তো দূরের কথা, পালাচ্ছেন, লেজগুটিয়ে পালাচ্ছেন। কিন্তু কতদূর? পালিয়ে কতদূর যাবেন আপনি, আপনারা?

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সকাল হয়ে গেছে টেরই পায়নি ওরা। বিন্তী আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সকালবেলার ঢাকাটা অদ্ভুত, একেবারে ফাঁকা, মিষ্টি মিষ্টি।'

'বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাও।' যুথী চারপাশটা দেখে বলল, 'ছায়া ছায়াও।'

'কিছুটা গ্রামের বাড়ির উঠোনের মতো।' সুশান্ত যুথীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'অথচ আমরা এই ঢাকাটা দেখার সুযোগই পাই না।'

'সুযোগ পাব কী!' পাভেল সুশান্তর একটা কাঁধ ছুঁয়ে বলল, 'ঘুম থেকে উঠতে উঠতেই তো সকাল শেষ।'

'ঢাকা নিয়ে এত কথা, কিন্তু মাত্র এক ঘণ্টা পরেই দেখা যাবে ঢাকার আসল রূপ।' সৌম্য হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'লোকে গিজ গিজ করে ঢাকা শহর। পা ফেলানোর জায়গা পাওয়া যায় না।'

'আচ্ছা বল তো, ঢাকায় জ্যাম হওয়ার প্রধান কারণ কী?' সুশান্ত

সৌম্যর পাশে সরে এসে বলল।

'ঢাকায় গাড়ি বেড়ে গেছে।'

'এটা একটা কারণ। ট্রাফিক পুলিশদের দায়িত্বহীনতা, এটা আরেকটা কারণ। কিন্তু সে কারণটার কথা কেউ তেমন করে বলে না সেটা হলো–রাস্তার পাশে পার্কিং করা। কোনো কোনো রাস্তা আছে তার তিন ভাগের দু ভাগ থামানো গাড়ি দখল করে রাখে!' সুশান্ত ওপাশের রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই দেখ, এত সকালেই তিন তিনটা গাড়ি থামিয়ে রাখা হয়েছে রাস্তার পাশে। রাস্তার প্রায় অর্ধেক দখল করে ফেলেছে।'

'অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রতিটা বিল্ডিংয়ের নিচের তলাটা পার্কিংয়ের জন্য রাখার কথা বলেছিল।' পাভেল বলল।

'অনেকে রেখেও ছিল।'

'কিন্তু নতুন সরকার আসার পর আবার ওইসব জায়গা অন্য কিছুর জন্য বরাদ্দ হয়ে গেছে, গাড়ি রাখার জায়গা উধাও।'

'আচ্ছা, এই সব কেউ দেখে না?' যুথী কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলে।

'না, যারা দেখবে তাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, কিংবা কেউ দেখলে তার চোখ দুটোও অন্ধ হয়ে যাবে।' সৌম্য কিছুটা রেগে গিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারই ভালো, নির্বাচিত কোনো সরকার এলেই সমস্যা।'

'জানিস, কথাটা না আমারও মনে হয়।' যুথী খুব নরম গলায় বলল, 'আরো ভালো লাগে দেশে যখন জরুরি আইন থাকে। সব কিছু কী সিস্টেমেটিকভাবে চলে, একদম ছিমছাম।'

'এই কথাটা আবার জোরে বলা যাবে না। তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা আবার অন্য কিছু ভাববে।' সৌম্য হাসতে হাসতে বলল, 'আমরা মানুষকে ভোট দেই কী জন্য, তারা নির্বাচিত হয়ে করে কী!'

'আচ্ছা, ওখানে অতো ভিড় কেন রে?' বিন্তী সামনের একটা বিল্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল।

'ওটা তো স্কুল।' সৌম্য বলল।

'ওই ছোট-খাটো বিল্ডিংটা স্কুল হয় কী করে?'

'ঢাকা শহরে ওর চেয়ে ছোট জায়গায় স্কুল বানানো হয়। ওসব স্কুল দেখে মনে হবে, মুরগির বাচ্চাকে যেমন করে খাঁচায় রাখা হয়, ওই বাচ্চাদেরও ওই রকম খাঁচায় রেখে অ আ শেখানো হচ্ছে।'

'অথচ বাচ্চাদের লেখাপড়ার পরিবেশ হওয়া উচিত খোলামেলা।' সুশান্ত বেশ রেগে গিয়ে বলে, 'আজকাল আরো একটা জিনিস প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে স্কুলেই ভর্তি করাতে যাস না কেন ডোনেশন লাগবে। তাও এক দুই হাজার না, বিশ থেকে একলাখ টাকা পর্যন্ত। কোনো কোনো স্কুল তো পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত চেয়ে বসে।'

'আচ্ছা, ঢাকা শহরে অনেক সরকারি স্কুল দেখা যায়, অনেক বড় জায়গা নিয়ে স্কুলগুলো, ওইসব স্কুলে লেখাপড়া হয় কেমন?' যুথী বলল।

'ঘোড়ার ডিম হয়।' সৌম্য আগের চেয়ে রেগে গিয়ে বলল, 'অধিকাংশ সরকারি স্কুলের টিচার নিয়োগ দেওয়া হয় যখন যে সরকার থাকে সেই সরকারের নিজের লোক থেকে।'

'মোট কথা দলীয়ভাবে।'

'হ্যাঁ। এরা না জানে শিক্ষা দেওয়া, না জানে লেখাপড়া।'

'এই সব অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের কীভাব বলবেন—তোমরা সৎ হও, চরিত্রবান হও, কখনো অন্যায় করো না তোমরা। কারণ নিজেরাই তো অসৎ, অন্যায় করে চাকরিতে ঢুকেছেন!'

পাভেল হাঁটার গতিটা একটু কমিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার স্পষ্ট মনে আছে আমরা যখন গ্রামের স্কুলে পড়তাম তখন তিনটা আপা ছিল আমাদের। তারা স্কুলে আসতেন সোয়েটার বুনানোর সব সরঞ্জামাদি নিয়ে। ক্লাসে ঢুকে তারা আমাদের দিকে তাকাতেন না, সোয়েটার বুনাতেন আর কথা বলতেন।'

বিকট একটা শব্দ হলো। ওরা সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা মিনিবাস একটা মাঝবয়সী লোককে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। লোকটা ফুটপাতের ওপর পড়ে কাতরাচ্ছে। মাথা ফেটে গেছে তার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফুটপাত।

দৌড়ে গিয়ে সৌম্য লোকটার পাশে বসে বলল, 'আঙ্কেল, প্লিজ আপনি একটু সজাগ থাকুন, জ্ঞান হারাবেন না প্লিজ।' পাঁজাকোলে করে লোকটাকে তুলে নেয় সৌম্য। তারপর ওদেরকে বলে, 'হাসপাতালে নিতে হবে, খুব দ্রুত।'

খালি একটা সিএনজি আসছিল সামনে থেকে। ওরা ডাকল, সিএনজি থামল না। আরো একটা খালি সিএনজি এল। ওটাও থামল না। রোড ডিভাইডারের গাছগুলোতে বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়া আছে, পাভেল ওদিকে

তাকাল। তারপর দৌড়ে গিয়ে একটা বাঁশ টেনে তুলে হাতে নিল ও। আরেকটা খালি সিএনজি আসছে। এবার আর কেউ থামাতে বলল না। পাভেল ওর বাঁশটা মেলে দিল সামনে। সিএনজি থেমে গেল। ড্রাইভার রেগে গেছে, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই পাভেল বলল, 'কোনো কথা না, আগে হাসপাতাল। কথা বললেই টুকরো টুকরো করে ফেলব সিএনজিটা।'

পাভেলের চোখ দেখে ভয় পেয়েছে ড্রাইভার। কোনো কথা বলল না, সৌম্য লোকটাকে নিয়ে সিএনজিতে উঠল, সঙ্গে পাভেলও। তার আগে সুশান্তর হাতে বাঁশটা দিয়ে বলল, 'তোরা আরেকটা সিএনজিতে আয়। তার জন্য এই বাঁশটা লাগবে।

সিএনজি দ্রুত চালাচ্ছে ড্রাইভার। লোকটার মাথা থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছে, সারা গা ভিজে গেছে সৌম্যর। কিছুদূর যেতেই সিএনজি থেমে গেল। সিগন্যাল পড়েছে, কিন্তু পাভেল উপরের দিকে তাকাল, সবুজ বাতি জ্বলছে। বিরক্ত হয়ে পাশে তাকাতেই পাভেল দেখল, শুধু তাদের সিএনজি না, আশপাশের সব গাড়ি থেমে আছে।

ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। পাভেল একটু শব্দ করে বলল, 'ভাই, সবুজ বাতি জ্বলছে তো, ছাড়ছেন না কেন?'

রোবটের মতো ট্রাফিক পুলিশটি বলল, 'দেরি হবে।'

'কেন?'

'প্রধানমন্ত্রী যাবেন।'

'কখন যাবেন?'

'সেটা তো আমাকে বলে নাই।' তীক্ষ্ণ গলায় ট্রাফিক পুলিশ কথাটা বলে একটু সরে দাঁড়াল। পাভেল আগের চেয়ে শব্দ করে বলল, 'ভাই, আমাদের সিএনজিতে একটা অ্যাকসিডেন্টের প্যাশেন্ট আছে, রক্ত ঝরছে। আপনি একটু ছাড়ুন।'

'ছাড়া যাবে না।'

'মানুষটা মারা যাবেন তো।'

'মারা গেলেও কিছু করার নাই। একটা গাড়ি ছাড়লে সবগুলো গাড়ি টান দেবে। আমার চাকরি নট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু মানুষটা তো মারা যাচ্ছেন।'

'বললাম না আমার কিছু করার নাই।'

সৌম্য পাভেলকে বলল, 'সিএনজির টাকাটা দিয়ে দে। আমি নেমে

যাচ্ছি।' কথাটা শেষ করেই সৌম্য দৌড়াতে লাগল। লোকটার মাথা থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছে, সারা রাস্তায় সারি করে ঝরছে রক্তের ফোঁটাগুলো, ঠিক রক্ত ঝরছে না, স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঝরছে, মানবতার প্রহসন ঝরছে, মনুষ্যত্বের স্খলন ঝরছে।

সৌম্য হাঁপাচ্ছে। পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষকে দু হাতে তুলে আধা কিলোমিটার দৌড়ে আসা, জিভ বের হয়ে এসেছে ওর। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছেই ইমার্জেন্সিতে ঢুকে চিৎকার করে ডাক্তার ডাকল ও। পাশ থেকে নার্স ধরনের একজন বলল, 'স্যারের আসতে দেরি হবে?'

ইমার্জেন্সি বেডে লোকটাকে শুইয়ে দিয়ে সৌম্য বলল, 'ইমার্জেন্সিতে সব সময় একজন ডাক্তার থাকার কথা না?'

'হ্যাঁ, থাকার কথা। কিন্তু উনি আজ অসুস্থ।'

'পরের ডাক্তার কখন আসার কথা?'

'নয়টায়।'

সৌম্য ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু এখন তো নয়টা চল্লিশ বাজে! কখন আসবেন উনি?'

'স্যার এখানে আসার আগে হেল্পসার্ভিস ক্লিনিকে যান? ওখানে কাজ শেষ করে এখানে আসবেন।'

'এটা সরকারি হাসপাতাল না?'

'জ্বি।'

'সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার প্রাইভেট ক্লিনিকে কেন? তাও এই অফিস টাইমে।' সৌম্য চিৎকার করে বলল।

'সেটা তো আমি জানি না।' ভয় ভয় গলায় বলল নার্সটি।

'হেল্পসার্ভিস ক্লিনিকটা গ্রীণ রোডে না?'

'জ্বি।'

লোকটা হঠাৎ হেঁচকি দিয়ে ওঠেন। পাভেল কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'সৌম্য?' সৌম্য চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখে, বমি করছেন লোকটা, রক্ত বমি।' সঙ্গে সঙ্গে ও চিৎকার করে নার্সটাকে বলল, 'আপা, আপনি একটু দেখুন। মানুষটা যেন কেমন করছেন।'

'আমি তো নতুন এসেছি। আমি তো দেখতে পারব না। ভয় করছে আমার।' নার্সটা ভয়ে অন্যদিকে চলে যায়।

সৌম্য লোকটার মাথা চেপে ধরে বলল, 'আঙ্কেল, পানি দেব, পানি

খাবেন। এখনই ডাক্তার এসে পড়বে। আপনি আর একটু টিকে থাকুন, আর একটু।' চোখে পানি এসে গেছে সৌম্যর।

যুথী, সুশান্ত আর বিন্তী দৌড়ে ইমার্জেন্সি রুমে ঢোকে। মানুষটাকে দেখে যুথী বলল, 'অবস্থা তো তেমন ভালো না রে!'

চোখ দুটো উল্টে যাচ্ছে লোকটার। সৌম্য মাথাটা আরো ভালো করে চেপে বলল, 'আঙ্কেল, আল্লার দোহাই লাগে, আর একটু...।'

গলা দিয়ে গোঙানি বের হচ্ছে লোকটার। বিন্তী হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বলল, 'মানুষটা তো মারা যাচ্ছেন। ডাক্তার কোথায়, ডাক্তার কোথায় গেছেন!' বিন্তী চিৎকার করতে থাকে গলা ফাটিয়ে। কিন্তু সব চিৎকারকে পাশ কাটিয়ে মানুষটা আস্তে আস্তে স্থির হয়ে যান, এমনই স্থির কোনোদিন আর জেগে উঠবেন না তিনি।

মানুষটার একটা হাত চেপে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে সৌম্য, তারপর আরো বেশি চিৎকার করে বলল, 'ওই কুত্তার বাচ্চা...।' সৌম্য কাকে গালিটা দিল, আপাতত এটা কেউ ভাবল না। তারা তাকিয়ে আছে মানুষটার দিকে, যে মানুষটা বাসা থেকে বের হয়েছে অফিসের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো কাজে। রাতে তিনি বাসায় ফিরবেন, তার ছেলে-মেয়েরা আকুল নয়নে অপেক্ষা করবে, ভালো-মন্দ কিছু রেধে স্ত্রী অপেক্ষা করবেন নির্ঘুম চোখে। অথচ তার আগেই লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কোনোদিন সেই ঘুম আর ভাঙবে না, কোনোদিনই না।

সৌম্য চিৎকার করে উঠল আবার।

মো. নাশেদ
প্রেসিডেন্ট
মালে, মালদ্বীপ

প্রিয় প্রেসিডেন্ট

মাত্র পাঁচ বছর আগেও আমরা আপনাকে চিনতাম না, চিনত না বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষই। কিন্তু এখন আপনাকে সবাই চেনে, একটু সমীহের চোখেই চেনে। নির্বাচিত হয়ে আপনার দেশকে যেভাবে গড়ে তোলায় প্রত্যয় নিয়ে আপনি শপথ নিয়েছিলেন, তা দেখে আমরা মুগ্ধ। আপনার কথা বলা, আপনার উদ্দীপনা, আপনার দৃপ্ততায় আমরা ভাবতাম—হায়, এরকম একটা মানুষ যদি আমাদের দেশে থাকত, আমাদের দেশটা শাসন করত! অথচ কত ছোট্ট আপনার দেশ, কিন্তু স্বপ্নটা কত বড়!

প্রাকৃতিক সম্পদ তেমন আপনাদের না থাকলেও দেশকে ভালোবাসার জন্য যে পবিত্র সম্পদ থাকতে হয় বুকের ভেতর, সেটা আপনার আছে। সমুদ্র সৈকত আর মাছকে কেন্দ্র করেই আপনাদের অর্থনীতির ভিত গড়ে তোলা, ভালোভাবে বেঁচে থাকা, সুন্দর করে জীবন অতিবাহিত করা।

চুপি চুপি আপনার কানে একটা কথা বলে রাখি—কোনো দেশে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা মানেই হলো বিপদ, ভয়ঙ্কর। যেমনটা বিপদে আছে সৌদি আরব, ইরাক, কুয়েত; যেমনটা সমস্যায় আছে আফগানিস্তান, যেমনটা চাপের মধ্যে আছে ভেনেজুয়েলা, নাইজেরিয়া। এই প্রাকৃতিক সম্পদ আপনার শান্তি নষ্ট করবে, যন্ত্রণা দেবে, অন্য দেশের লোলুপ দৃষ্টি প্রতিনিয়ত আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলবে, চক্রান্ত চলতে থাকবে আপনার বিরুদ্ধে; যতদিন না এইসব সম্পদ কারো হাতে তুলে না দিচ্ছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বিশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এশিয়ার কয়েকটা দেশ। তার মধ্যে বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ এগিয়ে। সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হয়ে ডুবে যেতে এ দু দেশের অধিকাংশ অঞ্চল, আবাসস্থল হারা হয়ে যাবে লাখ লাখ মানুষ। কিন্তু তার আগেই সুদূরপ্রসারী একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন আপনি। আপনার দেশের মানুষের কথা ভেবে, মানুষের ভবিষ্যতের কথা

ভেবে অস্টেলিয়ার কিছু দ্বীপ কেনার পরিকল্পনা করেছেন আপনি। আপনার এই মানবিক পরিকল্পনার কথা শুনে আমরা মুগ্ধ। সব দেশের সব শাসনকর্তা যদি এভাবে তার দেশের মানুষের কথা ভাবত, তাদের কথা চিন্তা করত!

উন্নত বিশ্বের পরিবেশদূষণের প্রতিবাদে কয়েকদিন আগে পানির নিচে মুখোশ পরে কীসের যেন একটা স্বাক্ষর করলেন। আপনার এই অভিনব আইডিয়াতে আমরা আবারও মুগ্ধ।

মাহাথীর মোহাম্মাদের পর আমরা এশিয়াতে আরো একজন রাষ্ট্রনায়ক পেয়েছি, যিনি নিজের চেয়ে দেশের কথা আগে ভাবেন, নিজের সুখের চেয়ে মানুষের সুখের কথা বেশি চিন্তা করেন।

হায়, আমরা যদি আমাদের দেশের জন্য একজন মানুষ পেতাম, এরকম একজন দেশপ্রেমী পেতাম!

হেল্পসার্ভিস ক্লিনিকে এসে রিসেপশন কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল সৌম্য। ওর পাশে দাঁড়াল যুথী, সুশান্ত, বিন্তী এবং পাভেলও। রিসেপশনিস্ট মেয়েটা কান থেকে টেলিফোনটা রেখে ওদের দিকে তাকাতেই সৌম্য বলল, 'ডা. আজমত মোল্লা কোথায় আছেন?'

'স্যার তো এখন রাউন্ডে।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'এগারটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।'

'প্রতিদিন এগারটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়?'

'জি, এগারটার পর স্যার আর থাকেন না।' টেলিফোন বেজে উঠল, মেয়েটা ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘড়ির দিকে তাকাল সৌম্য। এগার বাজতে পনের মিনিট বাকী। তারপর পাভেলের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'প্রতিদিন এগারটা পর্যন্ত উনি এই ক্লিনিকে থাকেন। যদি প্যাশেন্ট দশজন থাকেন তাও এগারটা, পঁচিশজন থাকলেও এগারটা। একটা মিনিটও তিনি বেশি থাকেন না, তারপর চাকরি বাঁচাতে দৌড়ান তার চাকরিস্থল সরকারি হাসপাতালে। কমার্শিয়াল হওয়ার একটা সীমা আছে!'

'এই অল্প সময়ে এতগুলো রোগীকে দেখেন কীভাবে?' যুথী রাগী রাগী চেহারা করে বলল, 'এখানেও ভালো করে রোগী দেখেন না, হাসপাতালেও ঠিকমতো ডিউটি করেন না!'

'আবার তুই তার প্রাইভেট চেম্বারে যাবি সেখানেও একেবারে সময় বেধে দেওয়া। রোগীর কাছে ভালো করে না শুনেই প্রেশক্রিপশন লিখতে

থাকেন, মাত্র এক দেড় মিনিটেই রোগী দেখা শেষ, প্রেশক্রিপশন করা শেষ, ভিজিট নেওয়া শেষ।' সুশান্ত চোখ-মুখ কঠিন করে বলে, 'মানুষজন এমনি কি ইদানীং অধিকাংশ ডাক্তারকে কসাই বলে ডাকে!'

'সবচেয়ে খারাপ লাগে কোনটা জানিস—।' সৌম্য রিসেপশনিস্ট মেয়েটার দিকে এক পলক তাকাল। ফোন ধরেই আছে মেয়েটা, হাসি হাসি মুখ করে কথা বলছে। এটা যে ব্যক্তিগত আলাপ চলছে তা মেয়েটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে ফোনটা বিজি রেখেছে মেয়েটা, অথচ এরই মধ্যে কেউ হয়তো জরুরি কোনো কল করছে।

কথা শেষ করে ফোন রেখে দিল মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠল সেটা। সৌম্য আবার ওদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন যে কোনো রোগীকেই চেক করার আগে একগাদা টেস্ট করতে দেয়। তাও আবার যেই সেই ল্যাবে করলে হবে না উনি যেটার কথা বলবেন সেই ল্যাবেই করতে হবে।'

'ওই যে কমিশন ব্যবসা!' পাভেল চেহারা বিকৃত করে বলল, 'আসলেই কসাই। আর একটা কথা তো অনেকেই জানে না। ধর, একটা ডাক্তার জ্বরের জন্য ভালো একটা কোম্পানির ভালো একটা ওষুধ লিখে দেন, ওই ওষুধে ভালো কাজও হয়; কয়দিন পর দেখবি তিনি অন্য কোম্পানির অন্য ওষুধ লিখছেন। কারণ কী জানিস?' সবাই উৎস্যুক হয়ে পাভেলের দিকে তাকায়। পাভেল আগের মতোই মুখ বিকৃত করে বলে, 'এখানেও গিফট এন্ড টেকের ব্যাপার। অধিকাংশ ডাক্তারদের বাসার ফ্রিজ কোনো না কোনো ওষুধ কোম্পানি থেকে পাওয়া। কী বুঝলি?'

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা হঠাৎ ফিসফিস করার মতো করে বলল, 'ওই যে, স্যার তার রুমে যাচ্ছেন।'

সৌম্য মেয়েটার দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকাল। পাশের একটা রুমে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা একজনকে ঢুকতে দেখল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে সৌম্য এগিয়ে গেল ওই রুমের দিকে। পর্দা সরিয়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি, আসতে পারি।'

বেসিনে হাত ধুচ্ছিলেন ডা. আজমত। দরজার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'এখন তো কোনো কথা শুনতে পারব না। আমার সময় শেষ, আমাকে এখন হাসপাতালে যেতে হবে।'

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল সৌম্য। পেছনে পেছনে ওরাও। সৌম্য আরো

একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'হাসপাতালে তো অবশ্যই যাবেন, কিন্তু এখন তো বাজে এগারটা পাঁচ মিনিট।'

'তো?'

'হাসপাতালে আপনার পৌঁছার কথা নয়টায়, কিন্তু আপনি দুই ঘণ্টা পর যাচ্ছেন।'

'এসব আপনি বলার কে?'

'অবশ্যই আমি কিংবা আমরা বলার কেউ। সকাল সাড়ে নয়টায় একটা প্যাশেন্ট নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা, আপনি যে হাসপাতালে চাকরি করেন সেই হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে। কিন্তু ওখানে ডাক্তার ছিল না, অথচ সেখানে আপনার থাকার কথা ছিল। মানুষটা মারা গেছে।'

'মারা গেলে আমি কী করব?'

'আপনি আর কী করবেন! নিজের দায়িত্ব ফেলে অন্য ক্লিনিকে সময় কাটাবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, শুধু টাকার জন্য; রোগীকে ভালোভাবে না দেখেই অযথা কিছু টেস্ট করতে দেবেন, কমিশন পাওয়ার জন্য; হাসপাতালের চেয়ে বেশি মনোযোগ দেবেন নিজের প্রাইভেট চেম্বারের প্রতি, আরো সম্পদ বাড়ানোর জন্য। আচ্ছা, একজন ডাক্তারের কত টাকা দরকার? এই যে আপনি এভাবে টাকা রোজগার করছেন, এটা কতটুকু বৈধ? এ টাকায় কেনা খাবার খেয়ে আপনার ছেলে-মেয়ের শরীরে রক্ত তৈরি হবে, সেই রক্ত কতটুকু পবিত্র হবে? প্লিজ, আপনার বিবেককে জিজ্ঞেস করুন, যদি আপনার সেটা থাকে।' থু করে ড. আজমতের পাশে একদলা থুতু ফেলে সৌম্য, তারপর রুম থেকে বের হয়ে আসে বেশ শব্দ করে।

•

খুব ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা—বাসায় ফিরে যাবে না আর। যতদিন বেঁচে থাকবে, এভাবেই থাকবে। আপাতত একটা হোটেল ভাড়া করেছে, পরে যা হয় একটা কিছু করা যাবে। যুথী হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আমার অ্যাকাউন্টে যত টাকা আছে, তোরা বসে খেয়েও শেষ করতে পারবি না।'

কর্কশ গলার একটা চিৎকারে চমকে ওঠে সৌম্য। বেড়াতে এসেছে ওরা সাভারে, স্মৃতিসৌধের সামনের গাছগুলোর নিচে বসে আছে। হঠাৎ ঝিমুনির মতো এসেছিল ওর। চোখ মেলে দেখে একটা বৃদ্ধমতো লোক স্মৃতিসৌধের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'ভেঙে ফেলব আমি ওটা। সবটুকু ভেঙে ফেলব, ভেঙে গুড়ো গুড়ো করে ফেলব।'

চিৎকার করে কথাটা বলছেন আর একটু পর সামনের বেদিতে বসছেন। এক মিনিটও বসে থাকেন না লোকটি। আবার লাফিয়ে উঠে বলেন, 'ভেঙে ফেলব আমি ওটা, ভেঙে গুড়ো গুড়ো করে ফেলব, মাটির সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দেব।'

সামনের বেদিতে আবার বসে পড়েছেন লোকটি। মাথা নিচু করে ওভাবে বসে থাকেন অনেকক্ষণ। সৌম্য উঠে লোকটার কাছে গিয়ে বলল, 'আঙ্কেল, একটু বসব।'

'বসবে? বসো। তবে একটু পর ওইটা—।' স্মৃতিসৌধের দিকে হাত উঁচু করে বললেন, 'কিন্তু ভেঙে ফেলব আমি। তখন মাথার ওপর পড়লে কিন্তু কোনো দোষ নাই আমার।'

'না, আপনাকে কোনো দোষ দেব না।' সৌম্য লোকটার পাশে বসতে বসতে বলল, 'আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে আমার।'

'অবশ্যই চেনা চেনা লাগার কথা।' চিৎকার করে ওঠেন তিনি, 'একাত্তরে যুদ্ধ করেছি আমি। এই হাত দিয়ে সতেরটা পাক হারামজাদাকে মেরেছি, দেশের ভেতরে শত্রুদের মেরেছি কয়েক ডজন। আমাকে না চিনলে কাকে চিনবে। আই ওয়াজ এ ফ্রিডম ফাইটার, নট ওয়াজ এ, স্টিল নাউ আই অ্যাম এ ফ্রিডম ফাইটার। মাই নেম ইজ গাজী সিফায়েত রহমান।' লোকটি সৌম্যর দিকে একটু ঘুরে বসে বলেন, 'গাজী কাকে বলে জানো তো? যুদ্ধে জয়ী হয়ে যারা ফিরে আসে তারা গাজী, যারা মারা যায় তারা শহীদ।'

'এতদিন এটা জানতাম না তো!'

'জানবে কী করে? তোমাদের এসব জানানোর সুযোগ দিয়েছে নাকি? সবাই আছে যার যার বাপ-দাদা-স্বামী-সন্তানের কথা প্রচার করার জন্য, আমাদের কথা কেউ বলে না, আমাদের কথা কেউ প্রচার করে না।'

'খুবই দুঃখের ব্যাপার।'

'শুধু দুঃখের ব্যাপার না, আফসোসের ব্যাপারও।'

লোকটা চিৎকার করে ওঠেন আবার, 'ওই তোমরা সবাই সরে দাঁড়াও। আমি ওইটা ভেঙে ফেলব, গুড়ো গুড়ো করে ফেলব ওটা। সরে যাও সবাই, সরে যাও...।' লোকটা স্মৃতিসৌধের সামনে দিয়ে দৌড়াতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর আবার আগের জায়গায় এসে সৌম্যকে বলেন, 'এখন আর তেমন দৌড়াতে পারি না, অথচ যুদ্ধের সময় এক হাতে বন্দুক আরেক হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে যা দৌড়ান দিতাম। একবার তো এক

রাজাকারের গালে থাপ্পড় দিয়ে তিন তিনটা দাঁত ফেলে দিয়েছিলাম। কী যে আরাম পেয়েছিলাম!'

'একটা কথা বলব?'

'তোমাকে তো মানা করিনি।'

'কিছু খাবেন আপনি?'

'তুমি খাবে কি না সেটা বলো?'

'আমরা খেয়েছি।'

'আমিও খেয়েছি। এই যে দেখো—।' গায়ের পুরনো ময়লা কোর্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা পাউরুটি বের করে তিনি বলেন, 'খাবে নাকি?'

'আরেকটা কথা বলব আপনাকে?'

'আমি কি কথার ওপর ট্যাক্স বসিয়েছি যে বেশি কথা বলা নিষেধ। তোমার যা মনে চায় বলো। তার আগে আমার কথাটা শেষ করে নিই।' লোকটি আবার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান, 'ওটা আমি ভেঙে ফেলব, ভেঙে ফেলব, ভেঙে ফেলব, ভেঙে ফেলব...।' একদমে অনেকবার বলে লোকটা আবার সৌম্যর পাশে এসে বসেন, 'শোনো ছেলে, তুমি আমাকে কী বলবে আমি জানি। আমি এরকম করছি কেন? আমি পাগলের মতো চিৎকার করছি কেন? তুমি তাও আমার পাশে বসে কিছুটা হলেও মমতা নিয়ে কিছু জানতে চাচ্ছো, অনেকেই সেটা জানতে চায় না। সবাই ভাবে পাগল। একবার খুব অভাবে পড়েছিলাম। নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোই মুশকিল ছিল। অগত্যা সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম একজনের কাছে।' মাথা নিচু করে ফেলেন লোকটা, আর কোনো কথা বলেন না।

সৌম্য লোকটার দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলল, 'আপনার বলতে ইচ্ছে না করলে বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু সবাইকে এটা জানানো দরকার, খুব জানানো দরকার। একটা স্বপ্ন ছিল—।' কথা শেষ না করে লোকটা মাথা নিচু করেই বলেন।

'কোনো সংকোচ না করে তাহলে বলে ফেলুন, প্লিজ।'

'ডিসি অফিসের অফিসের বড় কর্মকর্তা ছিলেন তিনি, আগে কখনো দেখিনি। কিন্তু পরে জানলাম একাত্তরে তিনি দেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন। কথাটা জানার পর মাথাটা ঘুরে উঠল। সেই ঘুরে উঠল, আর থামছে না।' গলা কেঁপে উঠল লোকটার।

'আপনি কাঁদছেন?'

'না, কেঁদে আর কী করব! ঘুম তো হয়ই না, যদিও একটু হয়, ঘুম ভাঙার পর কথাটা মনে পড়ে যায়। লজ্জায় তখন মরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মরতে পারি না। আত্মহত্যা কাপুরুষতার লক্ষণ। একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে কাপুরুষতার পরিচয় দেব!' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন লোকটা।

'আপনি কি বলবেন—আমাদের, আমাদের বয়সী ছেলে-মেয়েদের কী করা উচিত?' খুব আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করে সৌম্য।

'আমার জানা নেই, বাবা।'

'সত্যি জানা নেই?'

মাথা নিচু করে ফেলেন আবার তিনি। সেভাবেই বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে বলেন, 'এখনো দেশে অনেক মুক্তিযোদ্ধা রিকশা চালিয়ে জীবন বাঁচায়, ভিক্ষা করে জীবন বাঁচায়, অনেক মহিলা মুক্তিযোদ্ধা অন্যের বাসায় কাজ করে সারাটা দিন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু কোনো যুদ্ধাপরাধী, কোনো দেশদ্রোহী, কোনো রাজাকারকে কখনো এসব কাজ করতে দেখেছো?' তুমি জেনে রাখো ছেলে—।' কাঁপতে থাকেন লোকটা, 'এই দেশের কিছু হবে না, কিছুই হবে না। যারা জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছিল, এই দেশকে স্বাধীন করেছিল, তাদের অভিশাপে এই দেশের কিছু হবে না। আমার সমস্ত পূণ্যের কসম, আমার চোখের পানির কসম. এই দেশের কিছু হবে না। সারাজীবন ভিক্ষার থালা নিয়েই ঘুরতে হবে এদেশ থেকে ওদেশ, দেশের সমস্ত স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে সাহায্য আনতে হবে আঁচল পেতে। এই আমি বলে রাখলাম।' চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন লোকটা। হঠাৎ আবার লাফিয়ে উঠে বলেন, 'ভেঙে ফেলব আমি ওটা, ওটা দেখলেই আমার লজ্জা লাগে, আমার দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, ভেঙে ফেলব আমি ওটা, ভেঙে ফেলব, ভেঙে ফেলব, ভেঙে ফেলব...।'

লোকটা দৌড়াচ্ছেন, স্মৃতিসৌধের সামনে দৌড়াচ্ছেন। যেন সেই স্বপ্নটা ধরা চেষ্টা করছেন তিনি—রিক্ত মনে, নিঃস্ব হৃদয়ে, জগতের সমস্ত আকুলতা দিয়ে।

হঠাৎ তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। জল টলটল করা তার দু চোখে নেমে এসেছে এক টুকরো আকাশ। সেই আকাশের কোনো রং নেই, মেঘ নেই, এমন কি কোনো আলোও নেই। ছায়াহীন সেই আকাশটা, বর্ণহীন সেই আকাশটা, ঠিক তার মতো, তার জীবনের মতো!

ওসামা বিন লাদেন
আল-কায়েদা প্রধান
আফগানিস্তান, পাকিস্তান, আমেরিকা কিংবা অজ্ঞাত

জনাব

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আপনাকে—সারা বিশ্বের মানুষ এখন সেটাই জানে। আমরাও জানি। তাই তো আপনার ঠিকানায় লেখা হয়েছে তিনটি দেশের নাম, আরেকটা অজ্ঞাত। আফগানিস্তান আর পাকিস্তান লেখা হলে না হয় মানায়, কিন্তু আমেরিকা? মজাটা সেখানেই।

বলা হয়ে থাকে—আপনাকে ধরে ফেলেছে আমেরিকা অনেক আগেই এবং লুকিয়ে রেখেছে তারা কোনো গোপন স্থানে। আবার বলা হয়ে থাকে—আপনাকে ধরে ফেলেছে ঠিকই এবং মেরেও ফেলেছে কোনো একদিন। এও বলা হয়ে থাকে—আমেরিকা আপনাকে খুঁজে পায়নি এখনো। যে কথাটি সবচেয়ে বেশি বলা হয়ে থাকে-আমেরিকা জানে আপনি কোথায় আছেন, কিন্তু তারা কখনো আপনাকে ধরবে না।

সবগুলোর কারণ একটাই—আপনাকে ধরলেই নাকি অনেক দেশকে মিছিমিছি সন্দেহ করে আক্রমণ করতে পারবে না তারা, তারপর সাহায্য করার নামে আগ্রাসী তৎপরতা চালাতে পারবে না কোনোভাবেই। সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারবে না প্রকাশ্য ডাকাতিতে কিংবা একটা জুজুর ভয় দেখিয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ অনেক দেশের দুর্বল শাসকদের মতো বসাতে পারবে না তার পায়ের নিচে। এবার আপনিই বলুন—সারা বিশ্বের জন্য আপনি কতটুকু ক্ষতিকর কিংবা লাভজনক?

আপনার ছবি দেখলে কিংবা আপনার কথা শুনলে কিংবা আপনার কোনো বীরত্বময় খবর দেখলে কিছু মুসলমান বেশ উল্লসিত হয়ে ওঠে। তারা মনে করে, মুসলমানরা সব জিতে ফেলছে, সব কিছু কয়দিন পরেই তাদের আয়ত্তে চলে আসবে। কিন্তু আসল সত্যটা হচ্ছে—আপনার জন্য মুসলমানরা এখন সবচেয়ে বিপদে আছে, আতঙ্কে আছে। আপনার ওপর দোষ চাপিয়ে নতুন নতুন দেশে জঙ্গি সৃষ্টির নতুন খবর ছড়াচ্ছে এবং

অস্থির করে তুলছে সেই দেশটাকে।

অনেক বুদ্ধিমান মানুষ আপনি, তারপরও আপনাকে বলি—এই সময়ে, এই ডিজিটাল মুহূর্তে শক্তি অর্জনের জন্য আপনি যা করছেন বলে শোনা যায় তা মোটেই সঠিক পথ নয়। এখন শক্তি অর্জনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বুদ্ধি। মানবতাবিরোধী কাজ করে কখনো শক্তি অর্জন করতে পারেননি ফেরাউন, নমরুদ, হালাকু খান, হিটলার এমন কি সাদ্দাম হোসেনও। এভাবে যারা শক্তি অর্জন করতে চায় তারা কখনো জিততে পারেনি, পরাজয়ের নিকৃষ্টতম গ্লানিতে তারা বিদায় হয়ে যায় এ পৃথিবী থেকে, তাদের কেউ মনেও রাখে না, কদাচিৎ মনে করলে তা ঘৃণা ভরেই মনে করে। তো সেই হিসেবে আমেরিকার পরাজয়ও আসন্ন।

বিশ্বাস করুন অথবা না করুন।

সাভার থেকে বাসে করে ঢাকায় ফিরছে ওরা। ডানের সারিতে বসা পাভেলকে ফিসফিস করে ডেকে যুথী বলল, 'দেখেছিস?' আশপাশে তাকাল পাভেল, যুথী ঠোঁট চেপে বলল, 'ওদিকে না, আমার মাথার ওপর তাকা।'

পাভেল যুথীর মাথার ওপর তাকিয়ে বলল, 'কী?'

'কিছু লেখা আছে বাসের সঙ্গে?'

'আছে।'

'কী লেখা আছে?'

'শিশু, প্রতিবন্ধী, নারীদের জন্য নির্ধারিত নয়টি স্থান।'

'কী বুঝলি?'

'কী বুঝব?' পাভেল বোকার মতো যুথীর দিকে তাকিয়ে বলল।

'ওই লেখাটার মানে হচ্ছে এখানে শিশুরাও বসতে পারবে, প্রতিবন্ধীরাও বসতে পারবে, নারীরাও বসতে পারবে। এবার তুই বল, শিশু আর নারী কি এক?'

'না।'

'প্রতিবন্ধী আর নারী?'

'এ দুটো এক হতে যাবে কেন!'

'কিন্তু ওই কথাটার আসল মানে কিন্তু ওটাই। শিশু, নারী, আর প্রতিবন্ধীদের যে কেউ এখানে বসতে পারবে, সুতরাং ওই তিন শ্রেণী একই পর্যায়ের, তারা একই।' যুথী একটু থেমে বলল, 'এবার বল, নারীরা এগুবে কীভাবে? তথাকথিত নারীবাদী কিংবা নারীনেত্রীরা কিন্তু এসব নিয়ে ভাবে না। তারা বড় বড় বক্তৃতা দেয়, বড় বড় হোটেলে মিটিং করে, বড় বড়

মুরগির রান খায়, তারপর বড় বড় গাড়িতে চড়ে বাসায় ফেরে। তুই কি কখনো কোনো নারীনেত্রী কিংবা নারীবাদীকে দেখেছিস?'

'কী জানি, মনে করতে পারছি না।'

'যদি কখনো চোখের সামনে আসে তাহলে ভালো করে দেখে নিস, একেকজন নারীবাদী বা নারীনেত্রীর ওজন সমান চারজন গ্রামের সাধারণ মহিলার ওজন। জানিস, এনজিওর টাকায় এরা খায়, ঘুমায় আর শরীর মোটা-তাজাকরণ করে। রাবিশ!'

'অবিকল আমার মায়ের মতো।' সৌম্য চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, 'এরা শুধু নিজের খাবার খায় না, অন্যের খাবারও কেড়ে খায় আর কাজের মেয়ে পেটায়। কিন্তু এই কাজের মেয়ের দোহাই দিয়েই কোটি কোটি টাকা আনে দেশের বাইরে থেকে।'

যুথী একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'মেয়েরা এদেশে কোনো দিনই এগুতে পারবে না। মজুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা কম পায়, অথচ দু জনে সমান কাজই করে। সেদিন একটা খবর পড়লাম-দুলালী বৈশ্য নামে এক শিক্ষিকা ছয় মাস ধরে ক্লাস নিতে পারছেন না।'

'কেন?' বিন্তী আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি বলেছেন, আমরা শিক্ষিকা নয়, শিক্ষক চাই। অথচ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশেই ময়মনসিংহের চরনিখলা মডেল সরকারি স্কুলে বদলী করা হয়েছিল তাকে। কিছু বুঝলি?'

'ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক।'

'শুধু দুঃখজনক না, লজ্জাজনকও।' যুথী একটু থেমে বলে, 'তোকে আরেকটা খবর জানাই—রাজশাহী আবৃত্তি পরিষদের সভাপতি ও বেসরকারি সংস্থা সনাকের সদস্য মুনিরা রহমানকে সাধারণ গ্যালারিতে বসে এসএ গেমস দেখতে দেয়নি। তাকে আয়োজক পক্ষের লোকজন মেয়েদের জন্য নির্ধারিত স্থানে খেলা দেখতে বলে। অথচ মুনিরা বেগম স্বামী ও সন্তানসহ খেলা দেখতে এসেছিলেন। তিনি যদি মেয়েদের গ্যালারিতে যান তাহলে স্বামী, সন্তানদের ছেড়ে খেলা দেখতে হবে। তিনি বাসা থেকে বের হয়েছিলেন সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে খেলা দেখতে।' যুথী সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এবার কী বুঝলি? যে যতভাবেই চিল্লাচিল্লি করুক না কেন, মেয়েরা পাঁচশ বছর আগে যেমন ছিল অধিকাংশ মেয়েরা এখন তেমনই আছে। মাঝখান থেকে কবি নজরুল স্রেফ কবিতা লেখার স্বার্থে

লিখেছিলেন—যা কিছু কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। চাপাবাজি!'

ফার্মগেটে বাস থেকে নেমেই সুশান্ত বলল, 'কয়েক মিনিটের জন্য আমি আমার মোবাইলটা ওপেন করতে চাই।' অনুমতির প্রত্যাশায় সবার দিকে তাকাল ও।

সৌম্য সামনের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় সুশান্তর মোবাইলটা অনই থাক, ওর তো এদেশে তেমন কেউ নেই। তাই ওর কোনো খোঁজও নেবে না কেউ।'

'ঠিক বলেছিস।' বিন্তী সুশান্তর হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে নিজেই অন করে বলল, 'আমাদের সবার মোবাইল একবার অন করলে কেমন হয়। যদিও আমারটা আমি বাসায় রেখে এসেছি, পাভেলেরটা তো চুরি হয়ে হয়ে গেছে। বাকী রইল যুথী আর সৌম্যরটা।'

'না, আমি আমার মোবাইল অন করব না, সম্ভবত কখনোই আর না।' যুথী জেদী ভাব নিয়ে বলল।'

'আমারটাও না।' সৌম্য যুথীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি তা করতে গেলে মোবাইল অন করার আর প্রয়োজনই পড়বে না।'

যুথী সৌম্যর পিঠে হাত রেখে বলে, 'তোর বুক কাঁপছে না।'

'একদম না।'

'আমি কেবল ভাবছি—তারপর?'

'তারপর—।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সুশান্ত বলল, 'বাবা প্রতিদিন দোকান থেকে এসে আমাদের তিন ভাই-বোনকে কাছে ডাকতেন আগে। খুব আগ্রহ নিয়ে আমরা বাবার কাছে যেতাম। বাবা তখন ছলছল চোখে বলতেন; একটা গল্প বলব আমি তোমাদের।

দাদা তখন হেসে বলতেন, বাবা, তুমি তো শুধু গল্প বলতেই চাও, অনেকদিন ধরেই বলতে চাও। কিন্তু বলো না।

দাদার কথা শুনে বাবা হাসতেন। অনেকক্ষণ হাসার পর বলতেন, সম্ভবত এ গল্পটা আমার কোনোদিনই বলা হবে না। তোমাদের বরং আরেকটা গল্প বলি। বাবা এটুকু বলে থেমে যেতেন। দ্বিতীয় গল্পটাও তিনি বলতেন না। আমরা বুঝে যেতাম বাবার আসলে কোনো গল্প নেই। সারাদিন পর তিনি আমাদের কাছে ডেকে চোখ ভরে দেখতেন, তার সন্তানদের

দেখতেন। কারণ কি জানিস?'

বিন্তী ছলছল চোখে বলে, 'কী?'

'বাবা, অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন। সোনার সুক্ষ্ম কাজ করতে করতে তিনি টের পেয়েছিলেন চোখের পাওয়ার কমে আসছে তার এবং অচিরেই অন্ধ হয়ে যাবেন তিনি। তাই সারাদিন কাজ সেরে এসে তার সন্তানদের চোখ ভরে দেখতেন প্রতিদিন।'

'মনটা খারাপ হয়ে গেল।' সৌম্য গলা ভারী করে বলল।

'সব শেষে বাবা অন্ধই হয়ে যান। আমার এই অন্ধ বাবা নিজেকে নিরাপদ ভাবেননি এদেশে। কেন, সেটা জানিস?' সুশান্ত মাথাটা নিচু করে বলল, 'বাবার কখনো ইচ্ছে ছিল না বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে চলে যাবেন তিনি। কিন্তু সবাই ভাবত আমরা ইন্ডিয়ায় চলে যাব। আশপাশের প্রভাবশালী কিছু মানুষ কয়েক বছর আগে নামমাত্র দামে আমাদের সব কিছু জোর করে লিখে নেয়। আমরা তবু সেখানে বাস করতে থাকি। কিন্তু প্রতিদিনই একটু একটু করে চাপ আসতে থাকে—আমরা কবে ইন্ডিয়া চলে যাব, কবে জায়গা খালি করে দেব। বাবা প্রতিদিন বসে বসে ভাবতেন আর কাঁদতেন।'

যুথী সুশান্তর দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'যাবি নাকি একদিন তোর বাবাকে দেখতে?'

'না।'

'চল না, আমরা সবাই মিলে যাই।'

'আমি গেলে আমাকে আর আসতে দেবে না।'

'আমরা ছাড়িয়ে আনব।'

'না, থাক।' সুশান্ত সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলে, 'কীরে, খিদে লাগেনি কারো?'

'কখন লেগেছে!' পাভেল পেটের ওপর হাত রেখে বলল, 'সম্ভবত পেটের ভেতরের নাড়ি-ভুড়ি এতক্ষণ হজমও হয়ে গেছে।'

সুশান্ত সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখ তো, রাজীব না ওটা?'

'কোন রাজীব?' সৌম্য বলল।

'ওই যে ক্লাস নাইনে ওঠার পর হঠাৎ লন্ডনে চলে গেল যে।'

'অ, মোটা রাজীব। আমাদের ক্লাসে তো দুটো রাজীব ছিল—মোটা রাজীব আর চিকনা রাজীব।' সৌম্য সামনের দিকে তাকাল, 'অ, মোটা

রাজীবই তো। শালা তো আরো মোটা হয়ে গেছে। ওই রাজীব—।'

এক ডাকেই ঘুরে দাঁড়াল রাজীব। আগে চশমা পরত না ও, এখন, বেশ মোটা কাচের চশমা পরে আছে ও। চশমার কাচের ভেতর ওর চোখ দুটো বড় বড় লাগছে। সৌম্যদের দেখে এগিয়ে এসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। সুশান্ত ওর পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'চিনতে পারিসনি শালা?'

মুখটা হাসি হাসি করে ফেলে রাজীব, 'অবশ্যই। তোর সব এখানে?'

'তার আগে বল তুই এখানে কেন?' সুশান্ত হাত এগিয়ে দেয় ওর দিকে। রাজীবও এগিয়ে দিয়ে হাত মেলাতে মেলাতে বলল, 'তোদের পাঁচজনকে একসঙ্গে দেখব এতো স্বপ্নেও দেখিনি! যুথী তো আরো সুন্দর হয়ে গেছিস; বিন্তীর ওই আগের মতোই শান্ত শান্ত চেহারা, পাভেল রাগী, জেদি কিন্তু আবেগি; সৌম্য তোর কিন্তু একটু ভুঁড়ি বেড়েছে আর আমাদের সুশান্ত, সারাজীবন যে কম কথা বলত, তবে যাই বলত সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেই বলত।' রাজীব একটু এগিয়ে গিয়ে পাভেলকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আয়, তোকে একটু জড়িয়ে ধরি।' পাভেলকে জড়িয়ে ধরল রাজীব, একটু পর পিছিয়ে এসে বলল, 'ওকে কেন আগে জড়িয়ে ধরলাম, জানিস?'

সবাই আগ্রহ নিয়ে রাজীবের দিকে তাকাল। ও হাসতে হাসতে বলল, 'একদিন ওর সঙ্গে প্রচণ্ড মারামারি করেছিলাম আমি। এই যে—।' হাত দিয়ে বা গালটা দেখিয়ে বলে, 'এখানে একটা দাগ দেখছিস না, এটা কিন্তু ওর ঘুষির দাগ। কিন্তু মারামারিটা লেগেছিল কেন, জানিস?'

যুথী খুব আনন্দ নিয়ে বলে, 'কেন?'

'স্রেফ এক টাকার একটা কয়েন নিয়ে। স্কুল থেকে একসঙ্গে বাসায় ফিরছিলাম আমরা। রাস্তার মাঝে একটা এক টাকার কয়েন পড়েছিল, দুজন একসঙ্গে দেখে ফেলি হঠাৎ+ ও বলে, আমি আগে দেখেছি; আমি বলি, আমি আগে দেখেছি। এটা নিয়ে তর্ক; শেষে ঘুষাঘুষি, মারামারি।'

'শেষে কয়েনটা কে নিয়েছিল?' বিন্তী হাসতে হাসতে বলল।

রাজীর বলার আগেই পাভেল শব্দ করে হেসে উঠে বলল, 'কেউ না। দুজনের পারস্পারিক সিদ্ধান্তে কয়েনটা ফেলে দেওয়া হয় একটা পুকুরে।'

সৌম্য হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলল, 'এতো দেখছি আমাদের দেশের বড় দুই দলের মতো করেছিস তোরা! এত কিছু আছে আমাদের, সেগুলো ব্যবহার করে উন্নতি করবে কি হঠকারী সিদ্ধান্তে সেগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট

করে ফেলছে।' পাভেল আর রাজীবের পিঠে দু হাতে দুটো থাপ্পড় দিয়ে সৌম্য বলল, ' তোদের ভবিষ্যৎ তো দেখছি ঝরঝরে। বড় হয়ে দু দলের যে কোনো এক দলে যোগ দিস, তারপর দেখবি উন্নতি কাকে বলে!'

'আচ্ছা, তুই লন্ডনে গিয়েছিলি না?' সুশান্ত জিজ্ঞেস করল।

'এখনো আছি।' রাজীবের গলার স্বরে বেশ গর্বের ছোঁয়া।

'ভালো লাগে তোর ওখানে?'

'ভালো লাগবে না কেন ওখানে! বরং এখানে আসলেই ভালো লাগে না আমার। সত্যি বলতে কী, বাংলাদেশকে তো আমার দেশই মনে হয় না, একটা জঙ্গল মনে হয়—মানুষের জঙ্গল, পুরাতন সব গাড়ির জঙ্গল, চিৎকার-চেঁচামেচির জঙ্গল। আর ইংল্যান্ডে গিয়ে দেখিস দেশ কাকে বলে! সভ্যতা, শিক্ষা, ঐতিহ্য—সবকিছুতে অনন্য।' রাজীব বেশ অহংকারী হাসি হেসে বলল, 'আমি কিন্তু এখন বাংলাদেশী বলে পরিচয় দিই না, ইংল্যান্ডের পাসপোর্ট হয়ে গেছে আমার, নিজেকে এখন ইংল্যান্ডের নাগরিক বলেই পরিচয় দেই। তোরা আমাকে লন্ডনিও বলতে পারিস।' রাজীব আশপাশে তাকিয়ে বলল, 'ভালো কথা, চল আমরা কিছু খাই। তোদের আমি আজ খাওয়াব, কতদিন পর তোদের সাথে দেখা!' রাজীব এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'ওই যে একটা ভালো ফাস্টফুডের দোকান দেখা যাচ্ছে, চল, ওখানে গিয়ে বসি।'

মন খারাপ গেল ওদের আবার। রাজীব এ দেশে জন্মে; এ দেশের গরুর দুধ খেয়ে; শাক-সবজি, চাল, ডাল, গম খেয়ে বড় হলো; পানি খেল, বাতাস খেল, হাত-পা শক্ত করল; মাথায় বুদ্ধি বাড়াল; এ দেশের অ আ অক্ষর চিনল; ভাষা শিখল; এ দেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করল, এখন অন্য দেশে গিয়ে অন্য দেশের পরিচয় দিচ্ছে!

দু-এক টুকরা কী একটা খেয়ে বেশ ভাব-ভঙ্গির সঙ্গে খাবারের সব বিল দিয়ে চলে গেছে রাজীব, ওর নাকি কী একটা জরুরি কাজ আছে। ওরা এখনো খাচ্ছে। সৌম্য এক টুকরো ভেজিটেবল রোল হাতে নিয়ে বসে আছে সেই কখন ধরে। যুথী তাই দেখে বলল, 'কীরে, বসে আছিস কেন, খাচ্ছিস না কেন?'

'আমার এখন মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'রাজীবের কথা শুনে?'

'কী অদ্ভুত দেখ, একটা মানুষ কী অবলীলায় তার দেশকে ভুলে যায়। অবাক লাগে!'

'শুধু অবাক লাগে, পাভেল তো ঘুষি মেরে ওর গালে দাগ করে দিয়েছে। ওর কথা শুনে আমার তো ওর সারা মুখ ছেঁচে দিতে ইচ্ছে করছিল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, টাকা-পয়সা বোধহয় কেবল ওরই আছে।'

সুশান্তর ফোনটা বেজে ওঠে হঠাৎ। দ্রুত রিসিভ করে সেটা কানের সঙ্গে ঠেকায়, ওপাশ থেকে সুশান্তর মা চিৎকার করে বলেন, 'সুশান্ত রে, তোর বাবা আর নাই।'

ডান হাতে মাংসের একটা টুকরা ছিল সুশান্তর। আস্তে করে সেটা পড়ে যায় মেঝেতে। চোখ দুটো শূন্য হয়ে আসে ওর। মা ওপাশ থেকে চিৎকার করে কাঁদছেন আর বলছেন, 'এ দেশে আসাটা অন্ধ মানুষটি মেনে নিতে পারেনি রে বাবা, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে রাতে, আমরা কেউ টেরই পাইনি।'

বেশ কিছুক্ষণ পর কানের কাছ থেকে মোবাইলটা সরিয়ে সুশান্ত খুব স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'কাল রাতে বাবা আত্মহত্যা করেছে।' আর কিছু না, স্রেফ এটুকু বলেই দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো ও। দু চোখের গাঢ় বিষাদ গলতে শুরু করেছে ওর, সেটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বুকের ভেতরের নিঃশব্দ হাহাকারটা নিঃশব্দই রয়ে গেল, অবিরাম দহনে পুরতে লাগল সেটা নীল হয়ে।

সু চি
বিরোধীদলীয় নেত্রী ও শান্তিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত
ইয়াংঙ্গুন, মিয়ানমার

প্রিয় ম্যাডাম

শান্তিতে আপনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, অথচ আপনি নিজেই শান্তিতে নেই। ব্যাপারটা দুঃখজনক, লজ্জাজনকও।

১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আপনার দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি বড় ব্যবধানে জিতেছিল। কিন্তু সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি আপনার কাছে। উল্টো আপনি এখন গৃহবন্দি। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে—গৃহবন্দি কেন আপনি? আপনার দোষটা কোথায়? কতটুকু অপরাধ করেছিলেন আপনি?

বিশ্ব আজ স্পষ্ট দুভাগে বিভক্ত–শোষক এবং শোষিত। শোষিতরা সংখ্যায় বেশি হলেও শোষকরা শক্তিশালী এবং তারা এতই শক্তিশালী আগামী একশ বছরে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে কি না তা এ সময়ের সবচেয়ে বড় জ্যোতিষীও বলতে পারবে না। আপনি কোন দলের? যদি আপনি ক্ষমতা পেতেন, রাজ দরবারের চেয়ারে বসতে পারতেন তাহলে কি আপনি এতদিনে শোষক হয়ে যেতেন না? আপনিও কি বিশ্বের অনেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মতো একনায়কতন্ত্র কায়েম করতেন না? আপনি কি আপনার ওই দোতালা পুরনো বিল্ডিং ভেঙে মাল্টিস্টোরেড কোনো দালান বানাতেন না? নাকি আপনি হতেন প্রজাবৎসল এক শাসক, যিনি সারাজীবন তার প্রতিটি প্রজার জন্য আসন পেতে বসে থাকে?

কত বছর ধরে আপনি গৃহবন্দি! কিন্তু সারা বিশ্বের যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান আছে তারা কী করছে? কতটুকু ভূমিকা পালন করেছে তারা আপনার মুক্তির ব্যাপারে? না তারা আপনার পক্ষে কথা বলে মুখে ফ্যানা তুলেই ক্ষান্ত দিয়েছে? যাই করুক, আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, প্রতিটা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান চলে যাদের টাকায়, ওরা বক্তব্য রাখে তাদের বিরুদ্ধেই।

আপনি বলতে পারবেন মিসেস সু চি, শক্তিশালী অনেক প্রতিষ্ঠানই অনেক

বড় বড় অন্যায় করেছে এ পৃথিবীর অনেক মানুষের সঙ্গে, নানা দেশে নানারকম ভাবে, কোনো মানবাধিকার সংস্থা কি কোনো কিছু করতে পেরেছে তাদের বিরুদ্ধে? শুধু বড় বড় কথা, আর টাকার ভাগ নিয়ে আরাম-আয়েশ করা।

প্রিয় সু চি, আপনি কবে মুক্তি পাবেন ঠিক জানি না আমরা। নেলসন ম্যান্ডেলা পেয়েছিলেন সাতাশ বছর পর। আপনি যেদিনই মুক্তি পান না কেন, ঘর হতে বের হয়ে আসুন, দেখবেন, সমস্ত পৃথিবী আপনার অপেক্ষায়, জগতের সমস্ত ফুল ফুটে আছে আপনার জন্য—ভালোবাসা নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়ে আর পরম মমতা নিয়ে।

পাভেলরা যে হোটেলে উঠেছে সেখান থেকে সংসদ ভবন দেখা যায়। হোটেলের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে যুথী বলল, 'যতবার ওই দিকে তাকাই ততবার বুকের ভেতর ধ্বক করে ওঠে।'

'আমারও।' বিন্তী বিছানা থেকে উঠে যুথীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, 'মাঝে মাঝে জীবনটাকে খুব আপন মনে হয়, মায়া হয় নিজের জন্য নিজেরই।'

'কখনো মনে হয়, এই তো এটাই—এই যে সুক্ষ্ম বোধ জাগানিয়া সময়, এই যে তীক্ষ্ণ উপলব্ধি, এই যে সুনীল আকাশ, ডানা ঝাপটানো পাখি, নদীর ঢেউ, বাতাসে কেঁপে ওঠা লাউ গাছের ডগা, হঠাৎ হঠাৎ জানালা দিয়ে আসা কোনো এক চেনা-অচেনা ফুলের ঘ্রাণ, বর্ণিল প্রজাপতির শব্দহীন ডানা মেলে ওড়া—এসবই জীবন। আবার মনে হয়—ওই যে লোকটাকে একটা মিনিবাস এসে ধাক্কা দিয়ে গেল, ফুটপাতের ওপর পরে রইলেন তিনি রক্তাক্ত অবস্থায়, আমরা তাকে তুলে ধরলাম, সিএনজি পাচ্ছিলাম না আমরা, যদিওবা পেলাম যেতে চাচ্ছিল না সেগুলো, বাঁশের ভয়ে একজন রাজী হলো, প্রধানমন্ত্রী যাবেন বলে আরো দেরি হচ্ছিল আমাদের, সিএনজি থেকে নেমে দৌড়ে হাসপাতালে যাওয়া, হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার না পাওয়া, অবশেষে লোকটার মরে যাওয়া—জীবন এটাও।'

'জীবনের মানেটাই হচ্ছে পাওয়া না-পাওয়ার দোলায় সময় কাটানো, আশা আর হতাশার সংমিশ্রণ, ভালো আর মন্দের দ্বন্দ্ব, কখনো কখনো একা একা বসে নিজের সঙ্গে নিজের আত্মাকে মেলানো।' সৌম্য একটু শব্দ করে বলল, 'জীবনটা কখনো মায়ের মতো আপন, কখনো অমঙ্গলের মতো পর।'

'আবার এটাও মনে হয়—জীবন মানে কিছুই না। কিছুটা কালক্ষেপণ, কিছুটা দুঃখ, কিছুটা সুখ।' সুশান্ত মাথা উঁচু করে বলল, 'জীবনটা একটা

পরীক্ষাও, যাতে অধিকাংশ মানুষই ফেল করে।'

'কিন্তু আমরা করব না।' যুথী জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে সুশান্ত র দিকে তাকাল, 'আমরা কোনো পরীক্ষাও দেব না। আমরা যেটা ভেবেছি সেটা করেই ছাড়ব। জীবন তো একটাই, নাকি?'

'আচ্ছা, কোনো মানুষকে এর আগে চোখের সামনে মারা যেতে দেখেছিস?' সৌম্য সবার দিকে তাকিয়ে বলল।

'না।' যুথী বলল।

'আমিও দেখিনি।' বিন্তীও জানালা থেকে সরে এল।

'কিন্তু আমি দেখেছি।' সুশান্ত শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি একটা মানুষকে প্রতিদিন একটু একটু করে মরে যেতে দেখেছি। দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুজে তিনি বসে থাকতেন, আমি দেখতাম মৃত্যু তার আশপাশে ঘুরঘুর করছে; তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে মুখে ভাত তুলতেন, আমি দেখতাম মৃত্যু তার হাত কাঁপাচ্ছে; তার চোখের ভেতর ধূসরতা বেড়ে যাচ্ছিল, তার কপালের ভাঁজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল, তার নিশ্বাসের গতি বেড়ে যাচ্ছিল দ্রুত গতিতে। আমি দেখতাম মৃত্যুর কী স্পর্ধা, কী দাপট, কী হিংস্রতা, কত ভয়ঙ্কর! এই যে মানুষটা আছে—হাঁটছে, হাসছে, খেলছে; পর মুহূর্তেই সে নেই, কী নিদারুণ সেই চলে যাওয়া, কী করুণ সেই প্রস্থান, কী অবিশ্বাস্য সেই না থাকা!' সুশান্তর চোখ দুটো ভিজে উঠেছে, 'বাবা আর মৃত্যুকে আমি সব সময় পাশাপাশি দেখতাম। বাবা বেঁচে থেকেও মরে গিয়েছিলেন, প্রতিদিন একটু একটু করে, একটু একটু করে।'

যুথী এগিয়ে এসে সুশান্তর পিঠে একটা হাত রাখে, সৌম্যও রাখে। একটু পর পাভেল এগিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু আমাদের জীবনটা এমন হলো কেন? আমাদের দেশটার এমন পরিণতি কেন? কেন পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে প্রথম হবে আমাদের দেশ? দুর্নীতি কেন পিছু ছাড়ে না আমাদের? কেন আমাদের দেশটাতে এত অসৎ মানুষের জন্ম হবে, কেন এত মানুষে গিজগিজ করবে আমাদের সব জায়গা? কেন আমাদের দেশে এত অন্যায় হবে প্রতিদিন? কেন আমরা এত মিথ্যা কথা বলি, এত প্রতারণা করি? কেন এত লোভ আমাদের? না পাওয়ার কেন এত হাহাকার আমাদের মাঝে?'

'আমার মামা একটা চাকরিতে ঢুকছিলেন, সরকারি চাকরিতে। খুব বড় যে চাকরি ছিল, তা না। তবুও ওই চাকরির জন্য তাকে ঘুষ দিতে হয়েছিল পুরো তিন লাখ টাকা।' যুথী খাটের ওপর বসতে বসতে বলল,

'সেই মামা এখন কী করে জানিস?'

'তিনি এখন ঘুষ খান।' সৌম্য যুথীর পাশে বসে বলল।

'তিনি এখন কেবল ঘুষ খান না, গলা পর্যন্ত খান।' যুথী বিন্তীর দিকে হাত বাড়িয়ে পাশে বসিয়ে বলল, 'মামাকে আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—মামা, এত টাকা তোমার কীসের দরকার?

মামা বলেছিলেন, কোনো দরকার নেই।

তাহলে এত টাকা—।

মামা আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, টাকার প্রতি কখনো আমার তেমন লোভ ছিল না, তেমন প্রয়োজনও অনুভব করিনি। কেবল একটা চাকরির দরকার ছিল, সেটা অন্য কারণে। কিন্তু সেই চাকরি নিতে গিয়েই বুঝলাম—টাকা আসলে খুব প্রয়োজনীয় একটা জিনিস, সেটা না থাকলে কোনো কিছু হয় না, মানুষ সম্মান করে না, সমাজে দাম পাওয়া যায় না, প্রিয়জন দূরে চলে যায়, আপন হয়ে যায় পর, সবচেয়ে বেশি যেটা বোঝা যায় সেটা হলো, নিজের কাছে নিজেকেই অপাংক্তেয় মনে হয়, মূল্যহীন মনে হয়, মনে হয় নিরর্থক এই বেঁচে থাকা।

মামার কথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করি, তারপরও—।'

মামা আবার আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তোকে আমি আগেই বলেছি টাকার প্রতি তেমন কোনো লোভ ছিল না আমার। এই চাকরিই আমাকে শিখিয়েছে টাকা কত প্রয়োজনীয়। আমাদের মতো নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য ওই সময় তিন লাখ টাকা যোগানো যে কী কঠিন ছিল, তা কোনোদিনই আমি বুঝাতে পারব না। আমার বাবা গ্রামের জমি বিক্রি করেছিলেন, মা তার সব গয়না বিক্রি করেছিলেন, ঘরের কয়েকটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও বিক্রি করতে হয় আমাদের। মামা খুব কষ্ট নিয়ে বলেন, আমি বাবাকে তার ডবল জমি কিনে দিয়েছি, মাকে তার পাঁচ ডবল সোনার গয়না বানিয়ে দিয়েছি, একটা সংসারে যা কিছু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি জিনিস দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছি আমাদের সংসার। এবার বল, মানুষ ঘুষ খায় কেন?' যুথী সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সব কিছু কেমন যেন একটা চেইনের মাধ্যমে হচ্ছে। যে যেভাবে পারছে টাকা কামাচ্ছে। অনেকে হয়তো আবার এমনি এমনি ঘুষ খায়।'

'আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ সুযোগ পেলেই ঘুষ খায়। তার পেছনে কোনো কারণ-অকারণ থাকে না।' বিন্তী বলল।

'অনেকে সুযোগ পেলেও খায় না।' পাভেল বিন্তীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার এক ফুপা আছেন, পঞ্চাশ বছর বয়স। তার এক ছেলে বুয়েটে পড়ে, আরেক ছেলে মেডিকেলে পড়ে। দু মেয়ের এক মেয়ে পড়ে ঢাকা ভার্সিটিতে, আরেক মেয়ে হলিক্রসে। চার চারটা ছেলের লেখাপড়ার খরচ যোগান, সংসার চালান, এসব করতে গিয়ে তিনি অফিস শেষে দু দুটো টিউশনি করেন। বলতে পারিস, আমার সেই ফুপা কোথায় চাকরি করেন? কাস্টমসে। ঘুষ কী জিনিস তিনি জানেন না। অবশ্য তার ছেলে মেয়েরাও টিউশনি করে।'

'আচ্ছা, আমরা যারা ভোট দিই তারাই একদিন মন্ত্রী বা এমপি হয়। ভোটের আগে ওই মন্ত্রীর বা এমপির যে চেহারা থাকে ক্ষমতা পাওয়ার এক বছরের মধ্যেই তিনি আমূল পাল্টে যায়। তার চেহারা পাল্টে যায়, সম্পদ পাল্টে যায়, আচরণ পাল্টে যায়। আমার খুব ইচ্ছে এরকম একটা মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নেব আমি—আচ্ছা, এক বছরে আপনি কোন গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছেন যে, আপনার গাড়ি পাল্টে গেল, বাড়ি পাল্টে গেল, আপনার চেহারাও পাল্টে গেল।' সৌম্য মুখটা হাসি হাসি করে বলল, 'তখন কী বলবেন উনি বল তো?'

'কিছুই বলবেন না।' সুশান্ত গম্ভীর গলায় বলল, 'একজন মন্ত্রী বা এম পি একটা নির্বাচনে কত টাকা ব্যয় করেন? নির্বাচন কমিশন যা নির্ধারিত করে দেয় তার কয়েকশ গুণ বেশি। কেন তারা এত টাকা ব্যয় করেন? আমাদের স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে নির্বাচন একটা ব্যবসা। দেশ সেবা, মানুষ সেবা কিছু ফালতু শব্দ নিয়ে আমাদের মাথাটা ঘুরিয়ে ফেলে। ব্যবসা না হলে এত টাকা খরচ করেন কেন? টাকাগুলোইবা আসে কোথা থেকে?'

'পৃথিবীর খুব কম দেশের মন্ত্রী এমপি আছেন যারা আমাদের দেশের মন্ত্রী এমপির মতো রাতারাতি পাল্টে যান।' সৌম্য বিরক্তি নিয়ে বলে, 'এদের নিয়ে কথা বলাই তো রুচির ব্যাপার। না এরা মানুষ, না অন্য কিছু!'

'আরো একটা ব্যাপার আমাদের দেশে প্রকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। লেখাপড়া বাদ দিয়ে টেন্ডারবাজি, ভর্তিবাণিজ্য, চাঁদাবাজি নিয়েই তারা সারাটা সময় কাটিয়ে দেয়।' যুথী সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর সেটা হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি।'

'আমি এটার কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। কয়দিন আগে ছাত্রলীগের দু পক্ষের সংঘর্ষের সময় গুলিতে নিহত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী

ছাত্র আবু বকর সিদ্দিক। তোরা কি জানিস-বকরের বাবা কি করেন?' বিন্তী যুথীর দিকে তাকায়।

'কী?' যুথী অস্পষ্ট স্বরে বলল।

'দিনমজুর।' বিন্তীর গলাটা কেঁপে ওঠে, 'বকর নিজে কি করতেন?'

যুথী সমস্ত নিশ্বাস বন্ধ করে বলে, 'কী?'

'বকরও দিনমজুরি করতেন? দিনমজুরি করে তিনি নিজের লেখাপড়া চালাতেন, সংসারে সাহায্য করতেন। এভাবে স্কুল-কলেজ শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঢাবিতে কারা ভর্তি হতে পারে? দেশের সেরা ছাত্রগুলোই এখানে ভর্তি হয়। ছুটিতে বাড়ি গিয়েও এই সেদিন তিনি দিনমজুরের কাজ করেছেন। গত ঈদের ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে ছোট ভাই ওমর ফারুকের পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, 'আর একটা বছর কষ্ট কর, ভাই। আমি পাস করে বের হলেই ভালো একটা চাকরি হবে আমার। তখন আর কষ্ট থাকবে না আমাদের। অথচ তিন মাসও যায়নি, বকর আবার বাড়িতে গেলেন, চাকরি পেয়ে মিষ্টি হাতে নিয়ে নয়, লাশ হয়ে।' দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে বিন্তী বলল, 'এ ঘটনার পর আমাদের স্বরাষ্টমন্ত্রী কী বলেছেন, জানিস?'

আগ্রহের অতিমাত্রাতে যুথী এবার একটু শব্দ করেই বলল,'কী?'

'এক সাংবাদিক জানতে চেয়েছিলেন—বকরের নিহত হওয়া ও সারাদেশে কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারি দলের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সরকার কী ভাবছে? জবাবে স্বরাষ্টমন্ত্রী বলেছিলেন, এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এগুলো কোনো ব্যাপার না। এমনটি ঘটতেই পারে। তবে আমরা কী পদক্ষেপ নিচ্ছি সেটিই বড় বিষয়। তোরা বল, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা? প্রতিবছর অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী মারা যাচ্ছে রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে। বিএনপি ক্ষমতায় আসলে ছাত্রদল সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে ছাত্রলীগ। আমাদের দেশটা যেন লিজ নেওয়া কোনো সম্পত্তি, প্রতি পাঁচ বছর পর পর হাত বদল হয়, ক্ষমতার স্বাদ বদল হয়, যার যেমন খুশি তেমন ভাবে চলতে থাকে। এগুলো নাকি কোনো ব্যাপার না। তিনি কীভাবে বুঝবেন—সন্তান মারা গেলে বাবা কিংবা মায়ের কেমন লাগে?'

'কারণ তারা কোনো সন্তান নেই।' সৌম্য রাগে মুখ লাল করে বলল, 'নাড়ি ছেঁড়া ওই মা-ই জানেন সন্তান জন্ম দেওয়ার কী কষ্ট, ওই বাবাই জানেন একটা সন্তান বড় করার কত জ্বালা। দারিদ্র্য আর স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে ওঠা প্রতিটা

মধ্যবিত্ত বাবা-মা জানেন জীবন কত কঠিন, সন্তানকে মানুষ করা কত সাধনার। তিনি বা তারা কী পদক্ষেপ নেবেন? ওই ঘটনার এক দেড় মাস আগেও তো ছাত্রলীগ যা করল, কয়দিন পর ছাত্রদলও করল। কী পদক্ষেপ নিয়েছেন তারা? পদক্ষেপ নিতে নিতেই তো আরো একটা প্রাণ ঝরে গেল। আশারাখি, এবারেও পদক্ষেপ নিতে নিতে আরো কয়েকটা প্রাণ ঝরে যাবে।'

'আচ্ছা, আমাদের দেশের প্রতিটা স্বরাষ্টমন্ত্রী এভাবে আজেবাজে কথা বলেন কেন?' সুশান্ত থু করে একটা শব্দ করে বলল, 'মোহাম্মদ নাসিম বলেছিলেন, মাটির দশ হাত নিচ থেকে হলেও নাকি সন্ত্রাসীদের খুঁড়ে বের করবেন তিনি। অথচ সন্ত্রাসী মাটির নিচে থাকে না, মন্ত্রী-এমপিদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়, অনেকে তাদের পকেটে বসে ঘুমায়। আলতাফ হোসেন চৌধুরী স্বরাষ্টমন্ত্রী থাকার সময় শিশু নওশীনের মৃত্যুতে বলেছিলেন, আল্লার মাল আল্লায় নিয়ে গেছে। অথচ তার মতো মাল ঠিকই টিকে ছিল। লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছিলেন, উই আর লুকিং ফর শত্রুজ। শত্রু আবার খুঁজতে হয় নাকি! এখন যা শোনা যাচ্ছে, তিনি নিজেই তো দেশের শত্রু। আর আমাদের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? মন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই তিনি মাঝে মাঝে অন্যরকম সব বাণী ছাড়ছেন। আমাদের এখনই আত্মহত্যা করা উচিত!'

'তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সময় বেগম খালেদা জিয়া তার দু সন্তানের অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন, শেখ হাসিনা তার সন্তানের ব্যাপারে এতই উদ্বিগ্ন তিনি তাদের দেশেই রাখেন না। কিন্তু এই যে আমাদের মতো সাধারণ ঘরের সন্তানরা মারা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, তাদের জন্য কী করছেন তারা? তারা না আমাদের নেত্রী, তারা দেশ সেবক, মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখলে নাকি তাদের মন কেঁদে ওঠে? কই কেঁদে ওঠে?' সৌম্য আগের চেয়ে রেগে গিয়ে বলল, 'চল, আমরা এখনই আত্মহত্যা করি।'

'চল।' যুথী কথাটা বলেই ওয়াক ওয়াক করতে লাগল। একটু পর বমি করা শুরু করল ও। সৌম্য আর পাভেল অবাক হয়ে যুথীর দিকে তাকায়। বিন্তী ওদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি জানি ও কেন বমি করছে?'

পাভেল আর সৌম্য এক সঙ্গে বলে, 'কেন?'

বিন্তী কিছু বলল না। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সুশান্ত। সংসদ ভবনটাকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে ও ওখান থেকে।

শেখ হাসিনা-খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী
জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রিয় নেত্রীদ্বয়

খুব সকালে একদিন লাদেন গিয়ে বুশকে বলতে পারেন, আসসালামু আলাইকুম, জবাবে বুশ বলতে পারেন, গুড মর্নিং। এটা বিশ্বাস্য এবং সম্ভব। ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শেভেজের হাতে পুরো এক বছরের জন্য আমেরিকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন বারাক ওবামা, শেভেজ সেটা বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণও করতে পারেন। বিশ্বাস্য এটাও এবং সম্ভবও। এমনি কি ভারত আর পাকিস্তান পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো বন্ধু রাষ্ট্র হতে পারে, বিশ্বাস করি আমরা এটাও। কিন্তু আমরা এটা বিশ্বাস করি না—আপনারা দু জন কখনো মনের তাগিয়ে একটুক্ষণের জন্য পরস্পর কুশল বিনিময় করবেন, একজন আরেকজনের জন্য মঙ্গল কামনা করবেন, একজনের জন্য আরেকজন একটু এগিয়ে আসবেন। আমরা এটা বিশ্বাস করি—যেজনই আগে শেষ বিদায় নিন না কেন এ পৃথিবী থেকে, আরেকজন এক ফোঁটা চোখের পানিও ফেলবেন না তার জন্য, সামান্যতম দুঃখও হবে না অপরজনের জন্য, বোধে একটু স্পর্শও লাগবে না চির বিদায় নেওয়া ওই মানুষটার জন্য। আপনারা এমনই। এক প্রাণী মারা আরেক প্রাণী একটুক্ষণের জন্য হলেও মন খারাপ করে, কিন্তু মানুষ কেন করবে না—এটা ভাবতেই নিজেদের মানুষ পরিচয় দিতে ঘৃণা হয় আমাদের।

মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে—আপনারা পালাক্রমে পাঁচ বছর পর পর ক্ষমতায় আসেন। যিনি ক্ষমতায় আসেন তিনি ক্ষমতাহারার এমন নিন্দা করেন যেন পাঁচ বছর তিনি কোনো ভালো কাজ করেননি, একদিনও একটা ভালো কথা বলেননি। কলতলার মেয়েদের মতো সারাক্ষণই ঝগড়া লেগে থাকে আপনাদের।

জাতির ক্রান্তিলগ্নেও আপনারা কখনো এক হন না, একজন আরেকজনের

কাছে পরামর্শ করেন না, বরং সেই সময়টাতেও একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকেন নির্দ্বিধায়। সাধারণ মানুষের কাছে প্রমাণ করতে চান-এই ক্রান্তিলগ্নের জন্য অন্যজন দায়ী।

এ কথা এখন সবাই জানে আপনারা রাজনীতি করেন নিজেদের জন্য, জনগণের জন্য নয়। দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা নেই আপনাদের, নেই কোনো মমতাও। ব্যবসায়ীদের মতো মূলধন বাড়ানোর জন্যই আপনাদের যতসব কৌশল, কূশল, অভিনয়ের পূর্ণ মহড়া। আপনারা চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কথা বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন, স্বজনপ্রীতিকে ঘৃণার কথা বলেন, অথচ ক্ষমতা পেলেই সব কিছু ভুলে যান আপনারা।

এই সোনার দেশ আমাদের, তাকে অভাগা করে রেখেছে কারা? কারা এ দেশটাকে ভিক্ষুক দেশ করে রেখেছে এখনো? কারা দেশের সম্পদ লুট করে কেবল নিজেদের উন্নতি করছে? প্রিয় ম্যাডাম, আপনারা একটিবার নিজের বুকের সঙ্গে হাত রেখে বলতে পারবেন—দেশকে আমরা একশ' পার্শেন্ট ভালোবাসি? বলতে পারবেন আপনারা? বলুন, পারবেন?'

দু চোখ মেলে ওরা চারপাশে তাকাল এবং নিঃশ্বাস নিল বুক ভরে। সংসদভবনের ছাদ থেকে ঢাকা শহরের অনেক কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। উঁচু উঁচু দালানে ছেয়ে গেছে সারা শহর। এখানে দালান উঁচু হয়েছে, বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানির টাওয়ার উঁচু হয়েছে, উঁচু উঁচু বিলবোর্ড ছেয়ে ফেলেছে নীল আকাশ; কিন্তু মানুষ উঁচু হয়নি, বেঁচে থাকার মান উঁচু হয়নি, উঁচু হয়নি মানুষের মূল্যও!

ছাদের পশ্চিমের কোণায় দাঁড়িয়ে সুশান্তকে কী যেন বলছে বিন্তী। পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে সৌম্য, পাভেল আর যুথী একসঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সৌম্য বলল, 'আমাদের জানা দরকার তোর এমন হলো কেন?'

'না জানলে কী হয়?' যুথী হাসার চেষ্টা করল।

'কিছুই হয় না। তবে একটা বন্ধুর এরকম অনাকাঙ্খিত ঘটনা খুব কাছের বন্ধুরা জানতে চাইতেই পারে। এটা—।' হাত তুলে সৌম্যকে থামিয়ে দেয় যুথী। মাথা নিচু করে ছিল ও এতক্ষণ, চোখ তুলে সৌম্যর একেবারে চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'না, এটা মোটেই কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা না, বলতে পারিস কাঙ্খিতও না। খুব মন খারাপ করে কয়দিন আগে আমার এক বন্ধু এসেছিল আমার কাছে। ওকে সান্ত্বনা

দিচ্ছিলাম, ঠিক ওই মুহূর্তে হঠাৎ একটা কিছু হয়ে যায়। কোনো কিছু না ভেবে, একেবারেই হঠাৎ। না, এর জন্য আমার কোনো আফসোসও নেই। আফসোস কেবল একটাই—আমার পেটের এই ভ্রূণটা পৃথিবীর আলো দেখবে না কোনোদিন। সুশান্তকে আমি বলেছিলাম-।' যুথী হঠাৎ থমকে গিয়ে বলল, 'স্যরি, নামটা বলে ফেললাম তোদের কাছে!'

পাভেল কিছুটা শব্দ করে বলল, 'সুশান্ত!'

যুথী কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল, 'হ্যাঁ সুশান্ত। ওকে দেখলেই মনটা খারাপ হয়ে যায় আমার। জানিস, আমার এই অবস্থার জন্য একটুও দায়ী না ও। সবকিছু আমার ইচ্ছেতে হয়েছে। সুশান্তকে কথাটা বলতেই ও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, আমি যাইনি। কী হয়, এক জনমে একটু অন্যরকম কিছু করলে! আমরাও কি একটু পর অন্যরকম কিছু করব না, এই ছাদ থেকে বাংলাদেশের সবাইকে একটা অন্যরকম কিছু করে দেখাব না একসঙ্গে?' দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছাড়ল যুথী। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখন আমার প্রসঙ্গ থাক।' পশ্চিম কোণা থেকে সুশান্ত আর বিন্তীতে ডেকে, সৌম্য আর পাভেলকে নিয়ে, সংসদ ভবনের ছাদের সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়াল যুথী। সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল তারপর, 'এই যে এত দেশদ্রোহী শব্দটা উচ্চারিত হয় আমাদের দেশে, আচ্ছা বল তো, সত্যিকারের দেশদ্রোহী কারা?' যুথী ঘুরে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা আমাদের দেশের বিরোধীতা করেছে, তারা? তাদেরকে তো আমরা চিনি। কিন্তু চল্লিশ বছর যারা এই দেশটা শাসন করল, মুখোশ পরে আমাদের এটা ওটা বুঝাল, মুখে একটা মনে আরেকটা নিয়ে এই দেশটা চুষে খেল, মাত্র কয়েক দিনেই কোটি কোটি টাকা-বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়ে গেল, দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করল, তারা কারা? এই যে এত দুর্নীতিবাজ, চাপা পেটানো অসৎ রাজনীতিবিদ! এরাইবা কারা—দেশদরদী, না দেশদ্রোহী? এদের কি বিচার করা উচিত না?'

বিন্তী কিছুটা চিৎকার করে বলে, 'অবশ্যই।'

'কিন্তু বিচারটা করবে কে? সারাদেশেই তো এদের সংখ্যা বেশি। এরাই সারাদেশের মালিক সেজে বসে আছে, এরাই তো যা ইচ্ছে তা ই করে বেড়াচ্ছে। তোরা যদি মনে করিস, এরা দেশদ্রোহী, তাহলে ভুল।'

পাভেল একটু এগিয়ে এসে বলে 'তাহলে কারা?'

'আমরা।' যুথী চোখ-মুখ কঠিন করে নিজের বুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বলল, 'এই আমরা। এই আমরাই প্রতি পাঁচ বছর পর পর রোদে-বৃষ্টিতে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিই, সংসদে পাঠাই, ক্ষমতা গ্রহণের স্বাদ দিই। তারপর তারা দুর্নীতি করে, অসৎ হয়, নিজের দেশ, নিজের দেশের মানুষকে ভুলে গিয়ে, তাদের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, পদদলিত করে তাদের আশা আর স্বপ্নকে। কালোটাকায় ছেয়ে ফেলে তার নিজের কালো চেহারাকে। এই আমরাই তো তাদের ভোট দিই, ক্ষমতায় বসাই আমরা তাদের! দেশের শত্রু সৃষ্টি করে দেয় কারা, দেশের ক্ষতি করার জন্য কারা উদগ্রীব হয়ে থাকে? এই আমরা। এই আমরাই তাই সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহী! দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছাড়ে যুথী, কিন্তু চোখ দুটো ভিজে উঠেছে ওর। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের সেই বাধভাঙা জলকে থামানোর চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে বলে উঠল, 'সর্বপ্রথম এই আমাদের মৃত্যুদণ্ড চাই, আমাদের ধ্বংস চাই।'

সবাইকে ফাঁকি দিয়ে, কৌশল করে সংসদ ভবনের ছাদে উঠেছে ওরা। খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। ভবনের সামনের অংশ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। তিল ধারনের ঠাঁই নেই। ক্যামেরা হাতে টিভি সাংবাদিকরা এসেছেন, তাদেরকে লাইভ দেখাচ্ছেন বিভিন্ন টিভিতে; প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা এসেছেন, খসখস করে সংবাদ লিখছেন; বিভিন্ন রেডিও থেকে বিভিন্ন সাংবাদিক এসেছেন মাইক্রোরেকর্ডার হাতে নিয়ে। বিদেশী কিছু মানুষকেও দেখা যাচ্ছে, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে উপরের দিকে। চারপাশে হাজার হাজার পুলিশ। হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়ে এক পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, 'আপনারা নেমে আসুন, আপনারা যে উদ্দেশ্যে ওখানে উঠেছেন আপনারা নামুন, আমরা আপনাদের কথা শুনব। প্লিজ, আপনারা নামুন। দয়া করে এই ওই পবিত্র সংসদের ছাদে এমন কিছু করবেন না যাতে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়।'

সৌম্য মুচকি হেসে বলল, 'দেশের ভাবমূর্তি থাকলে তো নষ্ট হবে! ভাবমূর্তি কেউ রেখেছে নাকি, সেটা তো কবেই লুট হয়ে গেছে, চুরি হয়ে গেছে!'

'শুনেছিস, সংসদ নাকি এখনো পবিত্র আছে! এখানে যে পরিমাণ গালিগালি আর দেশ নিয়ে চক্রান্ত হয়েছে, এটা তো কবেই নষ্ট হয়ে গেছে, পচে গেছে রাস্তায় পড়ে থাকা ইঁদুরের মতো।' সুশান্ত দাঁত কিড়মিড় করে বলল।

পুলিশ অফিসার না, কোনো মন্ত্রী না, কোনো অভিনয় করা দেশ সেবকও না, কেউই তাদের শুনল না; ওরা যা বলল তার কোনোটাই তাদের কানে গেল না। পুলিশ কর্মকর্তাটি চিৎকার করেই যাচ্ছেন—প্লিজ, নেমে আসুন আপনারা, প্লিজ...।

পরস্পরের হাত ধরল ওরা পাঁচজন। আরো একটু এগিয়ে গেল ছাদের কিনারায়। খুব করুণ চোখে নিচে থাকা সহস্র মানুষের দিকে তাকাল ওরা। কেউ কৌতূহলী হয়ে, কেউ উৎকণ্ঠা নিয়ে, কেউ আনন্দ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

পরস্পরের হাত ছেড়ে দিল ওরা। পাভেল ওর পকেট থেকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রধানদের কাছে লেখা চিঠিগুলো বের করল এবং টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, 'কী লাভ এখন এসবের।'

সুশান্ত উপুড় হয়ে কপাল ঠেকাল ছাদের সঙ্গে। অনেকক্ষণ এভাবে থাকার পর বিড়বিড় করে বলল, 'ভগবান, ক্ষমা করো আমাদের। প্রিয় মাতৃকা আমার, প্রিয় স্বদেশ আমার, ক্ষমা করো তুমিও। এই যে এতো কিছু, এই যে অনিয়ম, এই যে এতে মানবতাহীনতা, এই তোমার বুকে, তবু তোমায় আমি—।' সুশান্ত ছাদের সঙ্গে কপালটা ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'তবুও তোমাকে আমরা ভালোবাসি দেশ, প্রিয় প্রিয়তমাজন আমার!'

যুথী ওর নিজের পেটে হাত দিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, বলতে পারল না। ডুকরে কেঁদে উঠল ও। বেশ কিছুক্ষণ পর কাঁদতে কাঁদতেই পেটে হাত রেখে বলল, 'দু হাত এক করে মাফ চাচ্ছি বাপ; এই দেশে, এইসব মানুষের মাঝে তোকে আনতে পারব না বাপ; তুই কষ্ট পাবি; দুঃখ, কষ্ট, লজ্জা আর ঘৃণায় মরে যেতে ইচ্ছে করবে তোর। তার আগেই তোকে-।' যুথী আর কিছু বলল না। কাঁদতে লাগল চিৎকার করে।

বিন্তীও কাঁদছে, জড়িয়ে ধরে আছে ও যুথীকে। কেবল সৌম্য লৌহ-পুরুষের মতো কঠিন চেহারা করে দ্রুত একটা কাজ করছে-পেছনে ছাদের ওপর বেধে রাখা লিফলেটগুলোর বাধন খুলছে ও।

হাজার হাজার লিফলেটগুলোর মধ্যে থেকে সবাই একটা করে লিফলেট হাতে নিল, তারপর পড়তে লাগল তারা একসঙ্গেই-

> নয় জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী নগো দিন দিয়েম, সমাবেশে হামলা চালিয়ে, ১৯৬৩ সালের ৮ মে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে ভিয়েতনামের ব্যস্ততম রাস্তা সায়গনের মাঝখানে হালকা নীল রঙের একটা অস্টিন গাড়ি এসে থামে ১৯৬৩ সালের ১১ মে। একদল ভিক্ষু নেমে আসেন সেই গাড়ি থেকে। সবশেষে নেমে আসেন বৌদ্ধদের কেন্দ্রীয় সমাবেশের প্রধান থিচ কুয়াং দুক, বয়স ৭৩ বছর। নেমেই তিনি আগে নেমে আসা ভিক্ষুদের বৃত্তের মাঝখানে পদ্মাসনে বসে পড়েন ধ্যানের ভঙ্গিতে। সঙ্গে সঙ্গে দু জন ভিক্ষু এসে গ্যাসোলিন ভর্তি একটা জার এনে ঢেলে দিলেন তা দুকের গায়ে, তারপর জ্বালালেন ম্যাচের কাঠি। মুহূর্তেই আগুনে ডুবে গেলেন বৃদ্ধ দুক। কিন্তু তিনি কোনোরকম ব্যথায় বা যন্ত্রণায় কাতরালেন না, কোনো শব্দ করলেন না, যেন কঠিন একটা মৌনব্রত পালন করছেন তিনি। মূর্তির মতো ঠায় বসে থাকা দুক মারা গেলেন সেখানেই।
অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে—থিচ কুয়াং দুকের পুরো শরীর ঝলসে গেলেও অক্ষত রেখে যায় হৃদপিণ্ডটা। সেটা এখন রাখা আছে ভিয়েতনামের রিজার্ভ ব্যাংকে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা একে বলে পবিত্র হৃদপিণ্ড।

ঠিক এরকম একটা নিঃস্বার্থ—পবিত্র হৃদপিণ্ডের খোঁজ করে করেছি আমরা অনেকদিন, পাইনি। আমরা এ দুয়ার থেকে ও দুয়ারে গিয়েছি, তবুও পাইনি। আমরা পেয়েছি স্বার্থে ভরা হৃদপিণ্ড, লোভে আক্রান্ত হৃদপিণ্ড, অন্তঃসারশূন্য হৃদপিণ্ড।
আমরা একদিন খেয়াল করলাম—কেউ নেই এ দেশটার। কোনো একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক নেই, নেই দেশকে ভালোবাসার প্রকৃত মানুষ, হৃদয় দিয়ে সেবা করার একজন আদর্শ দেশসেবক। ক্ষমতার জন্য তারা আগ্রাসী হয়ে ওঠে, ক্ষমতা পেলেই হয়ে যায় অন্ধ, পুরোপুরি অন্ধ।
ভালো মানুষও নেই এদেশে, যে দু-একজন আছেন, খারাপ মানুষের চাপে তারা বিলীন হয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।
অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে–সবাই কেন যেন এ দেশটা ছেড়ে চলে যেতে চায়, পরিচিত হতে চায় একজন আমেরিকান হিসেবে, কানাডিয়ান হিসেবে, লন্ডনি হিসেবে। প্রতিনিয়ত পাচার হচ্ছে মেধা, পাচার হচ্ছে শক্তি। এ দেশের খেয়ে, এ দেশের মাটিতে বেড়ে উঠে তারা পালিয়ে যায়, অন্য দেশের দাসত্ব করে, দাস হয়ে যায় পুরোপুরি। তাদের মুখে-চলনে-আচরণে কেবল সেই দেশ। বুকের কোথাও, এমনকি অস্তিত্বেও নেই এই দেশটা, তাদের জন্মভূমিটা। কেউ কেউ আবার এ দেশেই থেকে পাকিস্তানকে নিজের দেশ ভাবেন, কেউ কেউ ভাবেন ভারতকে। নিজের দেশ

নয়, সব চিন্তা তাদের ওই দেশ নিয়ে। হায়! সবাই যদি নিজেকে আমেরিকান, কানাডিয়ান, পাকিস্তানী, ভারতীয় ভাবে, নিজেদের সেই জাতি হিসেবে রূপান্তরিত করে–আমরা তাহলে কোন জাতি? আমরা কোথায় যাব?

আমাদের পুরো দেশটাকে কেউ কেউ অকেজো করে ফেলছে, মেরে ফেলছে কৌশলে, প্রতিনিয়ত করে ফেলছে দাস। আমাদের নিরীহ সাধারণ মানুষকে নিয়ে অনেকে খেলছে, ইতর প্রাণীর মতো ব্যবহার করছে আমাদের সঙ্গে, আমাদেরকে করছে মেরুদণ্ডহীন, আমরা হয়ে যাচ্ছি অবহেলিত, নিকৃষ্ট এক জাতি! মাত্র নয় জন মানুষকে মেরে ফেলার প্রতিবাদে ভিয়েতনামের থিচ কুয়াং দুক আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, আর পুরো দেশটাকে মেরে ফেলার জন্য আমরা কোনো প্রতিবাদ করব না!

হায়, কেউ কিছু করবে না বলে কী কিছু করব না!

পড়া শেষ করেই ছাদে রাখা হাজার হাজার লিফলেটগুলো ফেলতে লাগল ওরা নিচের দিকে। সবার মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—কে আগে লিফলেট হাতে নেবে, পড়বে, জানবে এই পাঁচ তরুণ-তরুণীর উদ্দেশ্য। কিন্তু এত কিছুর মাঝে অনেকেই খেয়াল করল না, লিফলেটগুলোর সঙ্গে নেমে আসছে ওই তিনটা ছেলে আর ওই মেয়ে দুটোও। কাগজগুলোর মতো ভাসতে ভাসতে ওরা নিচে নেমে আসছে, মুক্ত পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে আসছে, হাতে হাত রেখে, হৃদয়ের সমস্ত প্রশান্তি নিয়ে এবং এক সময় ওরা স্থির হয়ে গেল সংসদের কংক্রিট মেঝেতে।

খুব শখ ছিল ওদের—পাঁচজন মিলে একটা গ্রুপ ছবি তুলবে ওরা, তুলতে পারেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে কয়েকশ ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক করে জ্বলে উঠেছে, মেঝেতে শুয়ে থাকা ওদের গ্রুপ ছবি তুলছে। সবাই স্থির আছে উপুড় হয়ে; কেবল যুথী শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, পেটের ওপর একটা হাত রেখে, যেন পেটের ভেতর বেড়ে ওঠা কাউকে আদর করছে ও শেষবারের মতো।

আরো একটা শখ ছিল ওদের—সমুদ্রের পানিতে পা ভিজিয়ে সারাদিন বসে থাকবে ওরা একসঙ্গে আর গল্প করবে। ওদের আর পা ভেজানো হয় না সমুদ্রে!